প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৫৪

প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

ধর্ম ও প্রগতি

ধাতুগত অর্থে ধর্ম সমাজজীবনকে ধারণ করে, অর্থাৎ সামাজিক সংগঠনের ঐক্য, বিন্যাস ও ভারসাম্য রক্ষা করে। অসাধারণ ব্যক্তি-মানুষের নিরাভরণ সত্য-সন্ধান বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাকে এই অর্থে ধর্ম বলা চলে না। প্রচলিত অর্থে ধর্ম বিভিন্ন সংজ্ঞাবিশিষ্ট ঈশ্বর, অবতার-পয়গম্বর, শাস্ত্র-শরিয়ৎ, মন্দির-মসজিদ-গির্জা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, পাদ্রী-পুরোহিত-মোল্লা সম্প্রদায়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সংখ্যা গণনার অতীত ক্রিয়া-কলাপ ও আচার-অনুষ্ঠান, পরলোকতত্ত্ব এবং দৈনন্দিন কৃত্যাকৃত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশ, কাল, জাতি নির্বিশেষে ব্যবহারিক ধর্মের এই একমাত্র রূপ। ধর্মপ্রাণ এই ভারত-বর্ষে ইতিহাসের আদি পর্ব থেকেই অগণিত প্রাকৃতিক এবং অতি প্রাকৃতিক দেবদেবীর আবির্ভাব এবং সমাজ ব্যবস্থায় চতুর্বর্ণ থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ শত শত 'জাতি'র উৎপত্তি ব্যবহারিক ধর্মের এই আনুষ্ঠানিক এবং প্রতিষ্ঠানিক রূপকে অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী প্রকট এবং বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

প্রাচীনকাল থেকেই কোন কোন দুঃসাহসী চিন্তানায়ক ধর্মকে যুক্তিবিরুদ্ধ, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রগতির অন্তরায় এবং শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার বলে ঘোষণা করেছেন। এদেশে এই ধর্মবিরোধী চিন্তানায়কদের আদিগুরু বৃহস্পতি। মাধবাচার্যকৃত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বার্হস্পত্য দর্শনের এই উদ্ধৃতি আছে : "স্বর্গ নেই, মোক্ষ নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই, জাতিধর্ম নেই, কর্মফল নেই। ত্রিবেদ, ত্রিদণ্ড এবং ভস্মলেপন—এসব বুদ্ধি ও পৌরুষহীন কিছু মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র (বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা, ধাতৃনির্মিতা)।... ত্রিবেদের তিন রচয়িতা ছিলেন ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর (ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড ধূর্তানিশাচরাঃ)। পুরোহিতদের সমস্ত হাজর-বাজর (জর্ভরীতুর্ফরীত্যাদি) সম্পূর্ণ অর্থহীন শব্দমাত্র।" এই বৃহস্পতি-দর্শনের প্রধান ভাষ্যকার হিসেবে চার্বাক ঋষি প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাধবাচার্য বলেছেন যে, সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে চার্বাকদর্শনের প্রভাবই বেশী ছিল এবং সে কারণে 'নাস্তিকশিরোমণি' চার্বাকের দর্শনকে 'লোকায়ত দর্শন' নাম দেয়া হয়েছিল।

এই দর্শনে বলা হয়, প্রত্যক্ষ ছাড়া পরোক্ষ কোন প্রমাণ নেই। শরীর থেকে পৃথক কোন চৈতন্য নেই। মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও জল, এই চারিতত্ত্বের সমাহারে শরীর সৃষ্টি হয়। যেমন বিভিন্ন মিশ্রণে কোন কোন দ্রব্য মাদকতা গুণ লাভ করে। দেহাতীত কোন আত্মা নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন বহিঃশক্তির সহায়তা ছাড়া, এমন কি অদৃষ্টেরও সহায়তা ছাড়া, নিজে নিজেই সৃষ্ট হয়। রামায়ণে জাবালি ঋষিকে এই বার্হস্পত্য কিংবা চার্বাক দর্শনের প্রবক্তারূপে দেখা যায়। ভরতের অনুরোধ সত্ত্বেও অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক বনবাসী রামকে জাবালি উপদেশ দিচ্ছেন : "চতুর লোকের রচিত

শাস্ত্রগ্রন্থে আছে—যজ্ঞ কর, দান কর, ত্যাগ কর, তপস্যা কর ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য কেবল জনসাধারণকে বশীভূত করা। অতএব রাম, তোমার এই বুদ্ধি হোক যে পরলোক নেই। যা প্রত্যক্ষ তার জন্যই উদ্‌যোগী হও, যা পরোক্ষ তা পরিহার কর। তুমি সর্বসম্মত সদ্‌যুক্তি অনুসারে ভরতের সমর্পিত রাজ্য গ্রহণ কর।" প্রাচীন গ্রীসে পাইর্হো এবং এপিকিউরাস প্রমুখ দার্শনিকও ধর্ম সম্বন্ধে অনুরূপ মত পোষণ করতেন।

ধর্মকে যে স্বার্থপর ধূর্ত লোকেরা জনসাধারণকে বশীভূত করবার এবং ঠকাবার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, বৃহস্পতি-চার্বাক-জাবালির এই প্রাচীন মত আধুনিক যুগে বহুল প্রচলিত। ধর্মই ধনিক শ্রেণীর রক্ষাকবচ, ধর্ম না থাকলে গরীবেরা ধনীদের অনেকদিন আগেই খুন করে ফেলত—নেপোলিয়নের এই বিখ্যাত উক্তি অনেকেরই জানা। কিন্তু এই মতের প্রবক্তা হিসেবে কার্ল মার্কসই বর্তমান যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মত মার্কস Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right এবং অন্যান্য প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্ক্স বলেছেন, মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করেছে, ধর্ম মানুষ সৃষ্টি করেনি। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই ধর্মের উৎপত্তি। শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বহারাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে শোষকশ্রেণী ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ধর্ম তাই শোষিতের দীর্ঘশ্বাস, আমজনতার আফিম স্বরূপ। পরলোককে প্রথমে বর্জন করলে তবেই ইহলোককে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ধর্মরূপী আফিমের নেশা কাটিয়ে উঠলেই সর্বহারা শ্রেণী আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে উদ্যোগী হবে।

বৃহস্পতি-চার্বাক-মার্ক্সের এই বিশ্লেষণ যে বহুলাংশে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। জনসাধারণকে তাদের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য সর্বদেশে সর্বকালে মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণী (দেশবিশেষে তাঁরা যে নামেই অভিহিত হোন না কেন) সদা সচেষ্ট ছিলেন এবং আছেন। বস্তুত শতেক শতাব্দী ধরে এই বঞ্চনার মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। আর এই শাসন-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ধর্ম তাঁদের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছে। ঐতিহাসিক এই শোষণযজ্ঞে ব্রাহ্মণ শ্রেণী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ক্রীড়নক হিসেবে মদত যুগিয়েছেন। তাঁরাও বৃহস্পতি-চার্বাক বর্ণিত তাঁদের পরগাছাসুলভ শ্রেণীচরিত্র বজায় রাখতেই জীবিকার তাগিদে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন। ক্ষত্রিয়রা অর্থের জন্য বৈশ্যদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বৈশ্যরা তাঁদের বিষয় সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ছিলেন ক্ষত্রিয়দের উপর নির্ভরশীল। আর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের জীবিকার জন্য উভয় শ্রেণীর উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। তাই তাঁরা নানারকম শাস্ত্র ও নীতিকথা রচনা করে শূদ্র ও অস্পৃশ্য নামক বিপুল জনসাধারণকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রতি অনুগত রাখতে সাহায্য করতেন। আর এই মৌলিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা ব্রাহ্মণদের বাহ্যিক সম্মান দেখিয়ে, ভরণপোষণ বরং রক্ষণাবেক্ষণ করে, আমজনতার সামনেও সম্মানের আসনে বসিয়ে দিতেন। এইভাবে স্বল্পসংখ্যক লোকের এই তিন শ্রেণী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে অক্টোপাসের মত শোষণের বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছেন।

ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের শাসন-শোষণের অনুকূল শাস্ত্র ও বিধিনিষেধ রচনা করা ছাড়াও ব্রাহ্মণেরা রাজা ও রাজবংশের স্তুতি ও গুণগান রচনায় ব্যস্ত থাকতেন। সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য লোকোত্তর উৎস থেকে রাজবংশের উৎপত্তির ইতিহাস রচনা ছিল এই স্তুতিগানের প্রধান বিষয়বস্তু। উড়িষ্যার চাণ্ডেল্য রাজাদের কুলপুরোহিতেরা এমনকি এও ঘোষণা করেন যে চাণ্ডেল্যরা আদিদেব ব্রহ্মার প্রত্যক্ষ বংশধর। তাছাড়া রাজা এবং

তাঁর পিতৃপিতামহের কল্পিত শৌর্যবীর্য ও গুণরাশি বহুবিশেষণভূষিত গাথায় প্রকাশ করতে তাঁরা নিরন্তর সচেষ্ট থাকতেন। রাজার ইচ্ছার প্রতিকূল কোন চিন্তা কদাপি মনে স্থান দিতেন না, কিংবা মুখ দিয়ে তেমন কথা কখনো বেরিয়ে গেলে পরক্ষণেই তা যথাসাধ্য সংশোধন করবার চেষ্টা করতেন। জাবালি রামকে নাস্তিকসুলভ উপদেশ দিলে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের নিকট আশৈশব শিক্ষাপ্রাপ্ত রাম অত্যন্ত কুপিত হয়ে তাঁকে বললেন : "আপনার তুল্য বেদবিরোধী নাস্তিককে যাজকত্বে নিয়োগ করা পিতার অন্যায় হয়েছিল। বৌদ্ধ ও চোর যেমন, নাস্তিকও তেমনি।" চাকরি যাবার সম্ভাবনার কথা শুনে জাবালি বলে উঠলেন : "আমি নাস্তিকের বাক্য বলছি না, আমি নাস্তিক নই। পরলোকাদি কিছু নেই এমনও নয়। আমি সময় বুঝে আস্তিক বা নাস্তিক হই। তোমাকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করবার সময় উপস্থিত হয়েছে সেজন্য আমি নাস্তিক বাক্য বলেছি। আবার এখন তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য অন্যরূপ বলছি।" সক্রেটিস এবং যিশুখৃষ্ট যে মৃত্যুঞ্জয় নৈতিক সাহসের নজির রেখে গেছেন, দেশে দেশে কমজোর জাবালিকুল স্বভাবতই সে সাহস দেখাতে পারেননি। আবার অন্যদিকে বশিষ্ঠাদির অনুরোধে রাম কর্তৃক শম্বুক বধ ব্রাহ্মণদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ক্ষাত্রশক্তির অপপ্রয়োগের জ্বলন্ত উদাহরণ।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, জনসাধারণ প্রাচীন কাল থেকে ধর্মের এ আফিম গলাধঃকরণ করছেন কেন? তাঁরা কি বুঝতে পারেন না যে ধর্মের মোহাবেশ তাঁদের সর্বপ্রকার অগ্রগতির পরিপন্থী এবং শোষক ও উৎপীড়কের হাতিয়ার? কেন তাঁরা এই ভ্রান্ত চেতনাকে আশ্রয় করে কালঘুমে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন? এ প্রশ্নের অনেক উত্তর আছে, কিন্তু প্রধান উত্তর দুটি। প্রথম উত্তর দিয়েছেন ব্যবহারবাদ দর্শনে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানীরা। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষ তার জৈব অস্তিত্বের পরিপূরক পরিবেশকে গ্রহণ করে এবং পরিপন্থী পরিবেশকে বর্জন করে তা থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করে। আর প্রধানত এভাবেই আশৈশব তার সমস্ত চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহার গড়ে ওঠে। ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের এই জৈবিক প্রকৃতির সুযোগ নিয়ে তাকে শাস্ত্রানুগ তথা রাজানুগ রাখবার উদ্দেশ্যে তাঁদের রচিত কৃত্যাকৃত্য লঙ্ঘন কিংবা পালনের ফলস্বরূপ নরকযন্ত্রণা কিংবা স্বর্গ সুখের তত্ত্ব প্রচার করেছেন। ব্রাহ্মণদের বর্ণনা অনুযায়ী নরক সাধারণত অন্ধকার, আগুন, দুর্গন্ধ, ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতি মানুষের জৈব অস্তিত্বের পরিপন্থী উপাদানে গঠিত। আর তুলনাক্রমে স্বর্গ আলো, মলয়ানিল, সুগন্ধ, চিরযৌবন, অপ্সরা, পুষ্পিত কানন প্রভৃতি মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের পরিপূরক উপাদানে রচিত। এহেন নরকের ভয় এবং স্বর্গের লোভ দেখিয়ে ব্রাহ্মণেরা সরলবুদ্ধি এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে বশে রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন সিগমান্ড ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা। ফ্রয়েড The Future of an Illusion গ্রন্থে ধর্মের স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মকে অলীক দর্শন আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এ ধরনের অলীক দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হয়। প্রত্যেক মানুষই পারিপার্শ্বিক সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং জড় প্রকৃতির আঘাতে (যাকে সে বলে অদৃষ্ট) উৎকণ্ঠা থেকে আশৈশব কষ্ট পায় এবং ফলস্বরূপ অনেক সময় মানসিক বিকারে ভোগে। ধর্মরূপী অলীক দর্শন বা ইচ্ছাপূরণ মানুষকে এ কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দেয়। শৈশবের ভয়াবহ অসহায়তা ভালোবাসাঘন সুরক্ষার প্রয়োজন সৃষ্টি করে, আর সে প্রয়োজন মেটান পিতা। সারাজীবনের অসহায়তার অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় আরও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন একজন পিতাকে আঁকড়ে থাকবার প্রয়োজন। এভাবে কাল্পনিক দৈবশক্তির

দয়ার শাসন বিপদসংকুল মানবজীবনের উৎকণ্ঠা দূর করে। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত জগৎ সংসারের কল্পনা থেকে ন্যায়ের তাগিদের পূরণ হয়, যা নাকি বাস্তব মনুষ্য সভ্যতায় প্রায়ই অপূর্ণ থাকে। আর ইহলোকের এ জীবন পরলোকেও থাকবে, এ কল্পনা ইচ্ছাপূরণের দেশকালরূপী পরিবেশ সৃষ্টি করে। কার্ল মার্কসও ধর্মকে শুধু ভ্রান্ত চেতনাই বলেননি, এই ভ্রান্ত চেতনাকে অলীক দর্শনও আখ্যা দিয়েছেন, যদিও তিনি মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যাননি। তিনি বলেছেন, জনসাধারণের প্রকৃত সুখের জন্য তাদের ধর্মদত্ত অলীক সুখের উচ্ছেদ প্রয়োজন। ধর্মের অলীক পরিবেশ বর্জনের দাবি প্রকৃতপক্ষে সে বাস্তব পরিবেশ বর্জনেরই দাবি, সে পরিবেশে অলীক দর্শনের প্রয়োজন হয়।

॥ ২ ॥

ধর্ম যে রাজনৈতিক চেতনা ও প্রগতির পরিপন্থী তা যে-কোন দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়। এ দেশে প্রাচীন কাল থেকে জনসাধারণের যারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, সে শূদ্র ও অস্পৃশ্যরা মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে যেসব সামাজিক কৃত্যাকৃত্য ও দণ্ডনীতি রচিত হয়েছে, তা উচ্চনীচ বর্ণ অনুযায়ী গুরুতর অসাম্য ও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। গুরু অপরাধে উচ্চবর্ণের লঘুদণ্ড এবং লঘু অপরাধে নিম্নবর্ণের গুরুদণ্ডের বিধান প্রায় সব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রেই আছে। ধর্মশাস্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মানবিক অধিকার বা স্বাভাবিক অধিকার বলতে যা বোঝায়, এদেশ ধর্মের নামে তা থেকে অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত করেছে। খেটে-খাওয়া এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের চিরতরে দাবিয়ে রাখবার জন্য এমনকি কর্মফল ও জন্মান্তরবাদকেও বিকৃতভাবে শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ ধর্মশাস্ত্রগুলি বলছে যে এদের পক্ষে স্বীয় প্রচেষ্টায় কর্মফলের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। এহেন বিভীষিকাময় সমাজ ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক প্রগতি সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। এই ব্যবস্থার কুফল রাজনীতিক্ষেত্রে দুই ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশী শত্রুর আক্রমণের সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, স্বার্থ এবং চেতনার অভাববশত জনসাধারণ কখনো তাদের রাজার পক্ষে এবং বিদেশীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করেননি। ফলে জনসমর্থনহীন দুর্বল ক্ষাত্রিয়কুল সহজেই আগ্রাসীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রবিপর্যয় ও রাজকীয় স্বৈরাচার সত্ত্বেও অন্যান্য অনেক দেশের মত এদেশে কোন গণবিপ্লব, গণ-অভ্যুত্থান, এমনকি কোন গণ-ষড়যন্ত্রেরও নজির পাওয়া যায় না। ইতিহাসবিজ্ঞানী আরনলড টয়েনবি বর্ণিত আভ্যন্তরীণ প্রোলিতারিয়েত ধর্মের অনুশাসনে বহুধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। জন্মগত অসাম্য ও হীনস্থান যাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, রাজনৈতিক অধিকার কিংবা সাম্যের দুরাশা তাঁদের প্রভাবিত করতে পারেনি। ইউরোপে মধ্যযুগে রাজনৈতিক প্রগতির সূত্রপাত হয় একদিকে পোপ এবং তাঁর পুরোহিতকুল আর অন্য দিকে রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে। এই সংঘাতের ফলে ইউরোপের অনেক দেশে শুধু যে রাষ্ট্রের উপর ধর্ম সংগঠনের কর্তৃত্ব লোপ পায় তাই নয়, প্রোটেস্টান্ট ধর্ম এবং অন্যান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিমানুষের অপরাপর রাজনৈতিক অধিকারের দাবিও সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ দেশেও ধর্মের শাসনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় শাসনেই ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মের

বাঁধন আলগা না হলে রাজনৈতিক প্রগতি সম্ভব নয়, পৃথিবীর ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়।

মার্কিন মুলুকে আজকাল এক ধরনের তথাকথিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পয়দা হয়েছেন, যাঁরা বলছেন যে ধর্ম অনেক সময় রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক এবং অতএব প্রগতির উপাদান। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইসরায়েল প্রভৃতি দেশের উল্লেখ করেন। এঁরাই আবার একই যুক্তি দেখিয়ে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে সামরিক শাসনের সমর্থনে বিদগ্ধ নিবন্ধ রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এসব চলতি-হাওয়ার-পন্থী তথাকথিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মার্কিন সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্র নীতির সমর্থনে নিজেদের মগজের অপব্যবহার করছেন মাত্র। শিক্ষার প্রসার এবং রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ সর্বত্রই ধর্মান্ধতা বর্জন করে মানবতা এবং রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। তাছাড়া ধর্মান্ধতা কিংবা সামরিক শাসনের ফলে সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি পেলেও তাকে প্রগতি আখ্যা দেওয়া যায় না।

ধর্ম বিজ্ঞানের প্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকেও প্রতিহত করে। কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, ডারউইন প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত বৈজ্ঞানিককে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং পাদ্রীকুলের অসহিষ্ণু উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তাঁদের মতবাদ প্রচার করতে এবং জীবন কাটাতে হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, বাইবেলবিরোধী এই মতবাদ প্রচার করবার ফলে গ্যালিলিওকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রাণের ভয় দেখিয়ে দু'বার প্রকাশ্যে নতজানু হয়ে ভুল স্বীকার করতে এবং নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে এবং এই শর্তে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণদান করে যে তিনি জীবনে আর কখনো বাইবেলবিরোধী কথা বলবেন না, পাদ্রীদের না জানিয়ে কোথাও যাবেন না এবং কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করবেন না। বিজ্ঞানপ্রভাকর নিঃসঙ্গ গ্যালিলিও অন্ধ হয়ে যান এবং দুঃসহ বেদনায় অনন্ত অন্ধকারে জীবনের শেষ বৎসরগুলি অতিবাহিত করেন। বিবর্তনবাদের মত বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতেও ডারউইন ও তাঁর অনুগামীদের খৃষ্টধর্মের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আরও বহু পরিচিত ও অপরিচিত বৈজ্ঞানিককে ধর্মান্ধ পাদ্রীকুলের অত্যাচারে হয় তাঁদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ বর্জন করতে হয়েছে, নয়ত উৎপীড়িত জীবন-যাপন করতে হয়েছে। মধ্যযুগে পাদ্রীরা শবব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন বলে এবং চিকিৎসার পরিবর্তে নানারকম তথাকথিত দৈব প্রতিকারে বিশ্বাসী ছিলেন বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়েছে। বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁর Religion and Science নামক গ্রন্থে ইউরোপের পটভূমিতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সনাতন সংঘাতের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অন্ধ কুসংস্কার ছাড়াও পাদ্রীদের বিজ্ঞান-বিরোধিতার আর যে প্রধান কারণ রাসেল উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের দেশে প্রাচীন-কালে বৃহস্পতি-চার্বাকও বলে গেছেন। তা হচ্ছে এই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে লোকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হবে, ফলে পাদ্রীকুলের ক্ষমতার অবক্ষয় হবে, এবং তার ফলে তাদের আর্থিক আয় কমে গিয়ে কিংবা বন্ধ হয়ে গিয়ে জীবিকানির্বাহ দুঃসাধ্য করে তুলবে। আর রাষ্ট্রশক্তিও রাসেলের মতে অনেক সময়ই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে এই আশংকায় যে ধর্মের বাঁধন শিথিল হলে আমজনতা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে শুরু করবে। ঈশ্বর ও পাদ্রীদের ক্ষমতা অস্বীকার করে যে গণশক্তি স্বরূপে প্রকাশিত হবে, তা অচিরে রাজা-উজিরের তখ্‌ত-এ-তাউশও নড়িয়ে দেবে।

প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা প্রবল ছিল না বলে, হিন্দু ধর্মে খৃষ্ট ধর্মের সঙ্গে তুলনীয় সুসংবদ্ধ এবং শক্তিশালী ধর্মীয় সংগঠন ছিল না বলে, এবং প্রাচীন

যুগের পর থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়নি বলে এদেশে বিজ্ঞানের সংগে ধর্মের প্রত্যক্ষ সংঘাতের বিশেষ কোন নজির নেই। কিন্তু ব্যবহারিক ধর্মে কুসংস্কারপ্রসূত অন্ধ বিশ্বাস, বাধা-নিষেধ এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব এতই বেশী যে বর্তমান সময়ে ধর্ম এদেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে নিঃসন্দেহে প্রবল বাধাস্বরূপ। কিংবদন্তী, কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে ভিত্তি করে কোথাও নিরাকার ভগবানের পায়ের ছাপ, কোথাও হনুমানের আস্তানা, কোথাও সতীর দেহখণ্ড, কোথাও বা মনসা-শীতলার অধিষ্ঠান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাব, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও আবর্জনার স্তূপ জমে উঠেছে। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের আবাসস্থল কলকাতা শহরের পথে-ঘাটে অলিতে-গলিতে নানা দেবদেবীর ক্রমবর্ধমান আবির্ভাব সমাজের কুসংস্কার এবং ধর্মের নামে দুর্নীতি ও বৃহস্পতি বর্ণিত ধূর্তদের দ্বারা আর্থিক শোষণের জ্বলন্ত উদাহরণ। তাছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বণ তো হিন্দুদের ঘরে ঘরে পথে-ঘাটে লেগেই আছে। বর্তমানে আবার সারা দেশময় শত শত বাবার আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা শূন্য হাত থেকে ভস্ম, শিবলিঙ্গ, মধু প্রভৃতি বিতরণ করে থাকেন। দেশের ঘরে ঘরে এঁদের প্রতিকৃতি ও প্রতিপত্তি, আর সর্বত্র এদের প্রচারযন্ত্র কাজ করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কেউ যে এসব বাবাদের আদর্শ মানুষ রূপে গণ্য করেন না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, কোন মা-বাবাই চান না যে তাঁদের ছেলে এ ধরনের একজন বাবা হোক। এরকম সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁরা নিঃসন্দেহে মাকালীর কাছে গিয়ে পাঁঠা প্রভৃতি নানাবিধ লোভ দেখিয়ে মাকালীর সাহায্যে তা ঠেকাবার চেষ্টা করবেন। অতএব এ শুধু পুরুষকারহীন মানুষের জীবনের বিভিন্ন উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পাবার বাসনায় সিগমাণ্ড ফ্রয়েড বর্ণিত জীবনপিতার আশ্রয় গ্রহণ মাত্র। আপন কাজে অচল মানুষের মন্তর-তন্তর এবং সাধুস্তুতির মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে সস্তায় বাজীমাত করবার নিষ্ফল প্রয়াস।

ধর্ম এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রগতির কত পরিপন্থী তা পঞ্জিকার কোন একটি পাতা খুললেই দেখা যায়—যে পঞ্জিকা হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রায় সর্বপ্রকার কৃত্যাকৃত্য নিরূপণে ব্যবহার হয়ে থাকে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বেশীর ভাগ সময়ই কোথাও যাত্রা করা কিংবা কোন কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ কখনো ডাকিনী-যোগিনী-মঘা-ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতির প্রকোপে যাত্রা নিষেধ, কখনো বারবেলা অথবা ক্রূর নক্ষত্র বশত কোন কাজ করা নিষেধ। প্রতিদিনই কিছু না কিছু আহার এবং ব্যবহার নিষেধ। সোমবার ও বুধবার ছাড়া অন্য কোনদিন ক্ষৌরকর্ম নিষেধ। এসব বাধানিষেধ অমান্য করলে ধর্মের অমোঘ বিধানে ধনসম্পত্তিনাশ, সবংশে বিনাশ প্রভৃতি ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ব্রাহ্মণভোজন এবং ব্রাহ্মণকে দ্বাদশ দান, ষোড়শ দান প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে (সত্যদ্রষ্টা বৃহস্পতি ঋষিকে প্রণাম)। শহুরে মানুষ প্রতিটি কৃত্যাকৃত্য পালন করতে পারেন না সত্য, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ হিন্দুর বাড়িতে এসব যথাসাধ্য পালন করবার যে চেষ্টা করা হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদিকে এই পৃথিবীরই অন্যত্র কুসংস্কারমুক্ত মানুষ বিজ্ঞানের ভেলায় চড়ে মহাবিশ্বের লোকে লোকান্তরে জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে।

আর্থিক বিকাশের গতিকেও যে ধর্ম মন্থর করে দিতে পারে, তা আজ সমাজ-বিজ্ঞানী ও অর্থবিজ্ঞানীরা অকাট্য সত্য বলে মনে করেন। রিচার্ড টনি, ম্যাকস ওয়েবার, গুনার মিরডাল প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থবিজ্ঞানীরা ধর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই নিবিড় সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছেন। টনি তাঁর **Religion and the Rise of Capitalism** গ্রন্থে এবং ওয়েবার তাঁর **The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism** গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের অন্ধ

বিশ্বাসের প্রভাবে মধ্যযুগীয় ইউরোপের আর্থিক বিকাশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং রিফরমেশনের পর তুলনাক্রমে উদারপন্থী প্রোটেস্টান্ট ধর্মের প্রভাবেই পরবর্তীকালে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়েছে। ওয়েবার আরও দেখিয়েছেন যে শিল্পবিপ্লবের আগে ভারতের আর্থিক বিকাশের স্তর ইউরোপের চেয়ে নীচে ছিল না; কিন্তু তথাপি শিল্পবিপ্লব ভারতবর্ষে হল না এই কারণে যে জাতিভেদের লৌহ আবরণীর মধ্যে কোন অর্থনৈতিক উদ্যোগ কিংবা অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা সম্ভব ছিল না। যে সামাজিক সঞ্চরণশীলতা থেকে আর্থিক প্রগতির গতিবেগ সৃষ্টি হয়, জাতিভেদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় বন্ধন সে সঞ্চরণশীলতাকে স্তব্ধ করে দেয়। ভারতের আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে এর কুফল গুনার মিরডাল তাঁর Asian Drama গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আর্থিক বিকাশের পরিপন্থী ধর্মের আরেকটি দিক আছে, এবং তা হচ্ছে ধর্মের নামে অর্থের অপব্যবহার। টাকার সার্কুলেশনের প্রত্যেক রাউন্ডে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তবেই দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। টাকাকে সোনারূপো করে জমিয়ে রাখলে কিংবা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কাজে ব্যয় করলে আর্থিক প্রগতি মন্থর হতে বাধ্য। অথচ এদেশে টাকার এই দুই অপব্যবহারই ধর্মের নামে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। ভারতবর্ষের সব ধর্মস্থানে যত সোনারূপো জমা হয়ে আছে, তা সব সংগ্রহ করে উৎপাদনের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে অন্তত দু তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা যায়। কিন্তু ওগুলো শুধু অকেজো যকের ধন হয়েই পড়ে আছে এবং ধর্মস্থানগুলো লোকঠকানো ব্যবসা ছাড়া আর কোন কাজই করছে না। আর যে লক্ষ লক্ষ টাকা এসব প্রতিষ্ঠান দৈনিক আয় করে, তাও অন্তত দুই এক রাউন্ডে উৎপাদনের কাজে আসে না। গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি যে কোন ধর্মস্থানে গেলে জনসাধারণের কুসংস্কার, পুরোহিতকুলের এবং তাদের পশ্চাতে কায়েমী স্বার্থের লোকঠকানো ব্যবসা এবং অর্থের সামুদ্রিক অপচয় চোখের সামনে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ওঠে। অপচয়ের আরেকটি দিক হচ্ছে দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি পারিবারিক এবং বারোয়ারী পূজায় বিপুল অর্থব্যয়, যা নাকি উৎপাদনের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। বহু বায়ে যে মূর্তি, আলোকসজ্জা, বাজি পোড়ান প্রভৃতি করা হয়, তা সম্পূর্ণই বিনষ্ট হয় এবং তা থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না। অথচ অন্য কোন উল্লেখযোগ্য যৌবনসুলভ প্রমোদ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের যুবসমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

সামাজিক প্রগতির প্রথম ও প্রধান সোপান সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এই যে ব্যক্তি-মানুষ ক্ষুদ্র পরিবেশে তার সামাজিক সম্পর্ক ও চিন্তাধারাকে আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সমাজের সামূহিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হবে। কিন্তু এদেশে ধর্ম এর বিপরীত ফলই প্রদান করেছে। সনাতন ধর্মের নামে মানুষ এদেশে অপরের সঙ্গে একাসনে বসতে, অপরের সঙ্গে কিংবা অপরের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করতে, অপর মানুষকে স্পর্শ করতে, এমন কি তার ছায়া মাড়াতেও অস্বীকার করেছে। ঈশ্বরের সন্তান বলে স্বীকৃত কোটি কোটি মানুষকে দেবতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক ধর্মের সনাতন ঐতিহ্য এদেশে শুধু যে সমাজের গরিষ্ঠ অংশকে চরম অসাম্যের মুখে ঠেলে দিয়ে সামাজিক সচেতনতা থেকে বঞ্চিত করেছে তাই নয়, জাতিভেদের সর্বস্তরে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি এবং মনোবৃত্তিকে প্রায় অচল করে রেখেছে। ধর্মশাস্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক বর্ণের মানুষের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বর্ণধর্মের কৃত্যাকৃত্য আছে, কিন্তু স্বীয় বর্ণের গন্ডীর বাইরে কোন বৃহত্তর সমাজসত্তার অস্তিত্ব কিংবা তার প্রতি ব্যক্তি-

মানুষের কোন কর্তব্য বা আনুগত্যের উল্লেখ নেই। ব্যক্তিমানুষের সারাজীবনের কর্তব্যা-কর্তব্য স্বীয় বর্ণের চিরনির্দিষ্ট কক্ষপথেই অনন্তকাল ঘুরে ঘুরে চলবে। এক বর্ণের অপরিবর্তন কক্ষপথ অপরের কক্ষপথকে স্পর্শ করবে না।

মানবসমাজের সামাজিক প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম আরও একটি বিপজ্জনক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরের প্রকৃতির বিভিন্ন ভাষ্য, এক ধর্মের শাস্ত্রের সঙ্গে অন্য ধর্মের শাস্ত্রের গরমিল, অবতার-পয়গম্বরদের নিয়ে বিরোধ, ধর্মীয় সংগঠন, বিশ্বাস এবং আচার-বিচারের পার্থক্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মানব-সমাজ এক সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরিক এরিকসন মনুষ্য জাতির এ ধরনের কৃত্রিম বিভাজনকে নকল মানব-গোষ্ঠী সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। এই কৃত্রিম বিভাজন হয়ত প্রগতির পক্ষে খুব মারাত্মক হত না, যদি না ধর্মান্ধতা থেকে ধর্মবিদ্বেষ এবং হিংসার জন্ম না হত। বড় বড় ধর্ম-গুলোর অভ্যুত্থানের পর থেকেই তাদের মধ্যে এ ধরনের সংঘাত দেখা দিয়েছে। মধ্য-যুগীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস এর ভয়াবহ সাক্ষ্য বহন করে। আধুনিক যুগের আরম্ভে পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি আর্থিক স্বার্থ ছাড়াও অখৃষ্টান জগৎকে খৃষ্টান বানাবার আকাঙ্ক্ষায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মীয় অত্যাচার এশিয়া ও আফ্রিকায় অত্যন্ত প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। এশিয়ায় পাশ্চাত্ত্য ধর্মযাজকদের তাণ্ডব এবং তার পেছনে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের প্ররোচনা ও সমর্থনের নিদারুণ কাহিনী সর্দার কে এম পানিক্কর তাঁর Asia and Western Dominance গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। খৃষ্টান দেশগুলিতে ইহুদিদের বহু শতাব্দী ধরে নির্যাতনের কাহিনী সুবিদিত, আর এই নির্যাতনের প্রধান কারণ হল যে, যিশু ভগবানের নিজের ছেলে এবং একমাত্র ছেলে, বিজ্ঞানবিরোধী এই উদ্ভট তত্ত্ব ইহুদিরা স্বীকার করেন না। এই নির্যাতনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইহুদিরাও আবার ইসরায়েলে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে একরকম ধর্মান্ধতায় মেতে উঠেছে। আরব দেশগুলির সঙ্গে ইসরায়েলের বিরোধও অন্তত আংশিকভাবে ধর্মান্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে চিরায়ত করবার উদ্দেশ্যে মৌলিক ধর্মের মুখোসের আড়ালে সেসব দেশের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় রূপ দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আধুনিক যুগে ধর্মান্ধতাপ্রসূত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রধান বলি আমাদের এই ভারতবর্ষ। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত এদেশে অনেককাল ধরেই চলে আসছিল। ইংরেজ শাসনের শেষ অংকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। এই অন্ধ সংঘাতের নিদারুণ ফলশ্রুতি শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিভাজনই নয়, তার চেয়েও বহু গুণ মর্মান্তিক অযুত নিযুত মানুষের প্রাণবলি, মাতৃভূমি থেকে নির্মম উচ্ছেদ, দুর্বিষহ লাঞ্ছনা এবং অবর্ণনীয় আর্থিক ও সামাজিক দুরবস্থা। ধর্মান্ধতার বন্যায় ছিন্নপত্রের মত যে অগণিত অসহায় মানুষ নিরুদ্দেশ ভেসে গেছে, কোন শাস্ত্রের কোন ভাষ্য দিয়ে তাদের সে বিরাট ট্র্যাজেডিকে বিবেকগ্রাহ্য করে তোলা সম্ভব নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে ধর্মের অত্যাচারে মানুষের যত চোখের জল ঝরেছে, সপ্তসিন্ধু হয়ত বা সে অশ্রুধারাই বক্ষে ধারণ করে রয়েছে।

॥ ৩ ॥

ধর্মের সমর্থক বলবেন, ইতিহাসে ধর্মের নামে অনেক ব্যভিচার হয়ে থাকলেও ধর্মই সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ধর্ম না থাকলে মানুষের বলগাহীন স্বার্থবুদ্ধি কৃত্যাকৃত্য অগ্রাহ্য করে সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি করবে, ন্যায়-অন্যায় বলে আর কিছু থাকবে না, ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ জীবন স্বার্থের সংঘাতে কলুষিত ও রক্তাক্ত হয়ে উঠবে। একথার উত্তর এই যে, প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে যখন রাষ্ট্রশক্তি, রাজনৈতিক সংহতি ও আইনের শাসন দুর্বল ছিল, তখন সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ধর্ম হয়ত বা কিছুটা সাহায্য করে থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে, বিশেষ করে শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্র এবং জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভবের পর থেকে সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাও নিঃসন্দেহে একদিন ইতিহাসের নবতম পর্যায়ের জন্মদান করে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তার মধ্যেকার রাজনৈতিক সংহতি ও আইনের শাসনই সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে, প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগীয় ধর্মের শাসনের চেয়ে অনেক বেশী সফলতার সংগে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উৎকণ্ঠা থেকেই ধর্মের জন্ম হয়, আর উৎকণ্ঠার কারণ প্রধানত সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই নিহিত। আধুনিক রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দায়িত্ব সে পরিবেশকে সংশোধিত এবং উন্নত করে মানবজীবনের উৎকণ্ঠার মূল কারণ দূরীভূত করা। আর এ প্রয়াস কেবল রাষ্ট্রশক্তি ও গণপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই সফল করা সম্ভব।

সামাজিক পরিবেশকে রূপান্তরিত করবার এই গণপ্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহারের পেছনে অবশ্য গণসমর্থন এবং গণচেতনা থাকা প্রয়োজন। আর এই গণচেতনা শুধু বিজ্ঞানধর্মী লোকশিক্ষা এবং প্রগতিশীল গণআন্দোলনের মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করতে পারে। নতুবা সভ্যতার সংকট অবশ্যম্ভাবী। কারণ প্রকৃত শিক্ষিত যুক্তিধর্মী মানুষ সংখ্যায় অল্প। তাঁরা ধর্ম না মানলেও সভ্যবিধিতে অভ্যস্ত এবং এক অর্থে তাঁরাই সভ্যতার অগ্রগতির নায়ক বলে, ধর্মবিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও সমাজ ও সভ্যতাকে লণ্ডভণ্ড করবেন না। কিন্তু যে অগণিত অশিক্ষিত ও নিপীড়িত মানুষ মানবসভ্যতার কাছে বঞ্চনা ও শোষণ ছাড়া আর কিছুই পায়নি, সভ্যবিধিতে তাদের দিলও নেই আদলও নেই। জ্ঞানী মানুষের উদাহরণ দেখে এবং নিজ জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায় তারাও একদিন নিশ্চিত উপলব্ধি করবে যে ধর্ম মিথ্যা এবং অলীক দর্শন। বিজ্ঞানধর্মী লোকশিক্ষার মাধ্যমে যদি এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মায়, তবে সভ্যতার সংশোধনও ক্রমপরিবর্তনের রূপ নেবে। কিন্তু এই উপলব্ধি যদি অজ্ঞানতার অন্ধকারে সহসা একদিন বঞ্চিত মানুষের জীবনমনকে অধিকার করে, তবে বিদ্যেবোঝাই বাবু-মশাইদের সমস্ত নীতিবাক্যকে অট্টহাস্যে উড়িয়ে দিয়ে গদা হাতে মুষল হাতে সেদিন সে সভ্যবিধির ভিত নড়িয়ে দেবে, সমাজকে করবে তোলপাড়। এ-যুগের সে নয়া পরশুরাম শূদ্র বংশোদ্ভব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবাইকেই সে খতম করবে।

সত্যের সাধনায় জ্ঞানযোগই এ যুগের ধর্ম। সত্যসন্ধানী জ্ঞানযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কর্মযোগও হয় বিভ্রান্তকর ও নিরর্থক। বিশ্বপ্রকৃতির হৃদয়ের অন্তস্তলে, বিরাট বিশ্বভুবনের গ্রহতারকার দেশে কিংবা তার পরপারে যদি কোথাও কোন অতি-মানবীয় সত্তা বিরাজমান থাকে, তাকেও বিজ্ঞানের সহায়তায়ই আবিষ্কার করতে হবে, পাদ্রী-পুরোহিতের সহায়তায় নয়। জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে যে বিপুল অদৃশ্য শক্তি লুক্কায়িত আছে, তার আবিষ্কারও জ্ঞানযোগেরই ফলশ্রুতি, যাগযজ্ঞের নয়। মানবের দেহমনের গহনে যেসব গভীর সত্য আজও বিজ্ঞানের অজ্ঞাত, তাও একদিন

বিজ্ঞানের মাধ্যমেই উন্মোচিত হবে, মন্ত্র কিংবা রুদ্রাক্ষগণনার মাধ্যমে নয়। সমাজের রোগনির্ণয় ও তার প্রতিকারও বিজ্ঞানের সাহায্যেই হওয়া সম্ভব, জপতপের সাহায্যে নয়।

সত্যের সাধনারই এক বিকশিত রূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিঅন্ত এবং সৃষ্টিচরাচরের রহস্য সম্বন্ধে অনন্তজিজ্ঞাসা। এরই এক নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, এবং প্রগতির সঙ্গে এ জিজ্ঞাসার কোন বিরোধ নেই। সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানতপস্বী আইনস্টাইন এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নাম দিয়েছেন মহাবিশ্বচৈতন্য ধর্ম। তিনি বলেছেন যে এই মহাবিশ্বচৈতন্য না থাকলে কোন বিজ্ঞানীই তাঁর সাধনায় সফল হতে পারেন না। কিন্তু শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই জ্ঞানযোগের একমাত্র আধার নয়। জ্ঞানের অকূল পারাবারে সত্যসন্ধানের দিকও অসংখ্য। যে কোন দিকেই জ্ঞানযোগী সত্যসন্ধানে নিরত থাকুন না কেন, সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁকে পৃথিবীর অন্যদের হেলায় উপেক্ষা করে একাধারে তপস্বী এবং বিপ্লবীর জীবন যাপন করতে হবে। এ যুগে তিনিই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ তিনি যে উদয়াচলের অভিযাত্রী।

বিজ্ঞান, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা

মানবসমাজে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-বিচার থেকেই উদ্ভূত। বিশেষত ধর্মপ্রাণ এই ভারতবর্ষে রক্ত ও চারিত্রিক গুণাগুণ, খাদ্যাখাদ্য, স্পর্শ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষ, প্রাণী ও জড় পদার্থকে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কাল্পনিক তারতম্য অনুসারে স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পবিত্র বা অপবিত্র বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। শুধু আছে মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের পরিপূরক কিংবা পরিপন্থী বিভিন্ন বস্তু ও আচার-বিচার। ধর্মীয় প্রেরণা প্রসূত পবিত্রতা ও অপবিত্রতার সামাজিক সংজ্ঞা তাই অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে অন্ধ কুসংস্কার বলে প্রমাণিত হয়। অথচ বিজ্ঞানবিরোধী এই দুর্মর কুসংস্কারের শেকড় যুগ যুগ ধ'রে এ দেশের সমাজের গভীরে প্রবেশ করে নিঃশেষ করছে আমাদের জীবনীশক্তি আর স্তব্ধ করছে আমাদের জাতীয় প্রগতি।

প্রথমে তথাকথিত চারিত্রিক পবিত্রতার কথাই ধরা যাক। এ দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের গভীর বিশ্বাস যে, জন্মগতভাবে মানুষ কতকগুলি চারিত্রিক গণাগুণের অধিকারী হয়। প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রচার করে আসছেন যে, ব্রাহ্মণ প্রধানত সত্ত্ব গুণের অধিকারী আর তেমনিভাবে রজ গুণ ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের, তমঃ গুণ ক্রমবর্ধমান হারে শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের চরিত্রের প্রধান উপাদান। এ ধরনের কাল্পনিক চারিত্রিক পবিত্রতার ধারণার উপরই অনেকাংশে এ দেশে সেই ভ্রান্ত সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে যার উপর ভর করে অল্প সংখ্যক তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষ সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে চিরদিন শোষণ ও উৎপীড়ন করে আসছে। অথচ ঐতিহাসিক কিংবা বৈজ্ঞানিক কোন দিক থেকেই এ ধারণার বিন্দুমাত্র প্রমাণ নেই। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বহিরাগত আগ্রাসী আর্যরা এ দেশের আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে চতুর্বর্ণ প্রথার সৃষ্টি করেন। কালক্রমে পেশা, ধর্ম, ভৌগোলিক পরিবেশ, আর্থিক পটভূমি, সামাজিক আচার-বিচার প্রভৃতি বহু জটিল কারণ সমাবেশের ফলে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চতুর্বর্ণ প্রথা সহস্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত জাতিভেদ প্রথায় পর্যবসিত হয়। চতুর্বর্ণ সৃষ্টির আদিপর্বে কিংবা পরবর্তী জাতিভেদের মূলে কোথাও চারিত্রিক পবিত্রতা বা অপবিত্রতা কাজ করেনি। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত যে মানুষ জন্মগতভাবে কোন চারিত্রিক গুণাগুণ অর্জন করতে পারে। এ তত্ত্ব আজ সমাজবিজ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত যে, জন্মগতভাবে নয়, সামাজিক পরিবেশ থেকেই মানুষ আশৈশব চারিত্রিক গুণাগুণ আহরণ করে, আর পারিবারিক পরিবেশও এই সামাজিক পরিবেশেরই অন্তর্ভুক্ত। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণে মানুষের চরিত্র ব্যাখ্যা করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি এরূপ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তথাপি এ কথা প্রমাণ

হয় না যে, জন্মগতভাবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক সত্ত্ব ও রজঃ গুণের অধিকারী, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাকী সবাই তমঃ গুণের ধারক ও বাহক। উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশেই মানুষ উন্নত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী হয়, আর সমাজের সব মানুষের জন্য, বিশেষত নিপীড়িত গরিষ্ঠ অংশের জন্য, সেরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করাই মননশীল ও বিপ্লবী মানুষের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে বংশানুক্রমিক চারিত্রিক গুণাগুণের এই অলীক তত্ত্বের সঙ্গে রক্তের বংশানুক্রমিক চরিত্রবাহী ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিভিন্ন মাত্রার পবিত্র ও অপবিত্র রক্ত আছে, আর স্বকীয় পবিত্রতা বা অপবিত্রতার তারতম্য অনুসারে সে রক্ত তার আধার রূপী মানুষের চরিত্র নিরূপণ করে, বিজ্ঞান-বিরোধী এই উদ্ভট তত্ত্বের উপরই জাতিভেদভিত্তিক বিবাহ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, আর এ ধরনের বিবাহই জাতিভেদ প্রথার মূল উপাদান। এদেশের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীরা আবহমান কাল ধরে এই তত্ত্ব প্রচার করে এসেছেন যে, পবিত্র রক্ত তাঁদের শরীরেই প্রবাহিত আর অপবিত্র রক্ত সব তথাকথিত নীচ শ্রেণীর লোকেদের শরীরেই বর্তমান। অর্থাৎ, এ দেশের মুষ্টিমেয় পরগাছাকুলের রক্ত পবিত্র, আর কোটি কোটি সব খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত অপবিত্র। তথাকথিত পবিত্র ও অপবিত্র লোকেরা প্রায় সবাই এই তত্ত্ব মেনে নিয়েছে, আর নিজেদের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তরের পবিত্র ও অপবিত্র মানুষের শ্রেণীবিন্যাস করেছে। বংশানুক্রমিক রক্তের সঞ্চারের মাধ্যমে নিজেদের চারিত্রিক গুণ রক্ষার ভ্রান্ত প্রয়াসে সহস্র ভাগে বিন্যস্ত এবং অসংখ্য কুটিল আবর্তে আবদ্ধ জাতিভেদ প্রথাকে চিরায়ত করেছে।

কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে চরিত্রের সঙ্গে রক্ত কিংবা জীবকোষের কোনই সম্পর্ক নেই। রক্ত কিংবা জীবকোষ মানুষের দৈহিক আকার-প্রকার অনেকাংশে নির্ণয় করে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব কিংবা চরিত্রের সঙ্গে রক্তের কিংবা জিনের কোনও সম্পর্ক নেই। পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ, বিশেষত উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা এবং স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠিত হয়। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যক্তিগত প্রয়াসের মাধ্যমে শূদ্র কিংবা অস্পৃশ্যের ঘরে উন্নত চরিত্রের অধিকারী মানুষ নিঃসন্দেহে গড়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর দেশে দেশে প্রতিনিয়ত এ জিনিস ঘটছে। অপর পক্ষে, এসবের অভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ঘরে অনুন্নত চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব সর্বদাই সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত জীববিজ্ঞানের মতে মানুষের রক্ত রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত এবং দূষিত কিংবা রোগমুক্ত বা বিশুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু পবিত্র বা অপবিত্র হতে পারে না। রোগাক্রান্ত রক্তযুক্ত মানুষ স্বাস্থ্যহীন হয়, আর বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী স্বাস্থ্যবান হয়। এর সঙ্গে শ্রেণীভেদ জাতিভেদের কোন সম্পর্ক নেই।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অতএব রক্তের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা এবং তৎসংক্রান্ত চারিত্রিক উন্নতি বা অবনতি বলে কিছু নেই। ভারত-জাত এই বহুব্যাপ্ত ধারণা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেও এই জাতীয় কুসংস্কার প্রাচীন কালে ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে একমাত্র ভারতেই এ ধরনের অন্ধ বিশ্বাস প্রকট ও সর্বব্যাপী রূপে বর্তমান। বংশানুক্রমিক রক্তসঞ্চারেও অতএব তথাকথিত চারিত্রিক পবিত্রতার রক্ষণ কিংবা ক্ষতিসাধন সম্ভব নয়। জীবকোষের মাধ্যমে যা সঞ্চারিত হয় তা মানুষের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রোগ বা স্বাস্থ্য, প্রকৃতি বা ব্যক্তিত্ব নয়। যে ব্রাহ্মণ পিতা স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শূদ্র পাত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ না দিয়ে রুগ্ন অশিক্ষিত এবং অনুন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করেন তিনি নিজ কন্যা এবং তার বংশধরদের প্রধান এবং প্রত্যক্ষ শত্রু। তিনি পাপী, আর নরক ও বিদেহী আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তবে

তিনি নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পর সপ্তনরক গুলজার করবেন।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের মতে জীবকোষের সুদূর প্রসারী সঞ্চারেই মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্য উন্নত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকলে কালক্রমে জৈবিক অবক্ষয় দেখা দেয়। অনেক আধুনিক জীববিজ্ঞানী তাই উন্নত স্বাস্থ্যসম্পন্ন নির্বাচিত দম্পতির মিলনের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে উন্নত মনুষ্য জাতি সৃষ্টির পক্ষপাতী। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে জাতিভেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ প্রথা পবিত্রতার নামে মানুষকে অনিবার্য জৈবিক অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। খর্বকায়, শীর্ণদেহ, শক্তিহীন জাতির পক্ষে পৃথিবীর কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হয়ে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করা কদাপি সম্ভব নয়। দেশের বহুমুখী আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনও তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

॥ ২ ॥

খাদ্যের পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধেও অনুরূপ বিজ্ঞানবিরোধী কুসংস্কার আমাদের সমাজ জীবনকে দুর্বিষহ বাধা নিষেধে আড়ষ্ট করেছে, আর জনস্বাস্থ্যের করেছে নিদারুণ ক্ষতিসাধন। পবিত্র-অপবিত্র মানুষের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ প্রথা যেমন পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের এক বেনজির বৈশিষ্ট্য, তেমনি শুচি-অশুচি খাদ্যের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের জাতীয় খাদ্যাভ্যাসও জগতের মধ্যে এদেশের এক অবাক বৈশিষ্ট্য। এ কথা অনেক সময়ই আমাদের স্মরণ থাকে না যে, সারা দুনিয়ায় ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিরামিষাশী। পরিব্রাজক ফাহিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গুপ্তযুগের প্রথমেই ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজন সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল; বিশেষ করে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সকলেই নিরামিষাশী ছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহাত্মা গান্ধীর খাদ্য দর্শন, তাঁর ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর অবিসংবাদী নেতৃত্বের ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন পরোক্ষ ভাবে এক নিরামিষ প্রচার আন্দোলনে পরিণত হয়। গান্ধীজীর বিভিন্ন আশ্রম এবং সারা দেশময় হাজার হাজার গঠনমূলক কর্মকেন্দ্র নিরামিষ আহারের প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে। আমিষভোজীরা স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীতে পরিণত হন। পরবর্তীকালে সর্বোদয় আন্দোলনের মাধ্যমেও এ প্রচার অব্যাহত গতিতে চলেছে। অথচ একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর সব দেশের সব মানুষই প্রধানত আমিষভোজী। সারা পৃথিবী অপবিত্র, আর ভারতের এই কিছু মানুষই কি শুধু পবিত্র ?

কি কারণে এ দেশে এমন বিস্ময়কর খাদ্যাভ্যাস গুপ্তযুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে তা গভীর গবেষণার বিষয়। একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এ দেশে প্রাচীন কাল থেকেই প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল এবং সে কারণেই নিরামিষ আহার এ দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। এ ব্যাখ্যা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর নয়। সম্ভবত বুদ্ধদেব নিজেই মাংসভোজী ছিলেন। সম্রাট অশোকের সময়েও খাদ্যের জন্য প্রাণিহত্যা অব্যাহত ছিল। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৌদ্ধ দেশগুলিতে দেখা যায় যে, সেখানকার জনসাধারণ বহুকাল ধরেই গরু, শূকর সমেত সর্বপ্রকার আমিষ খাদ্য বিনা দ্বিধায় এবং সানন্দে গ্রহণ করে আসছেন। তা ছাড়া

মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্ম এ দেশ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাল রাজাদের অধীনে যে বঙ্গদেশ একদা বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে নিরামিষভোজী নেই বললেই হয়। জৈন ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সম্ভবত গভীরতর। মহাত্মা গান্ধী গুজরাটের বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং নিরামিষ ভোজন উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। কিন্তু জৈন কিংবা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকেরা ভারতীয় নিরামিষাশীদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

দ্বিতীয় প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, বৌদ্ধ, জৈন কিংবা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে নয়, হিন্দু ধর্মের অদ্বৈত দর্শনের প্রভাবেই এ দেশে নিরামিষ ভোজন চলে আসছে। কিন্তু এ যুক্তিও বুদ্ধিনির্ভর নয়। পূর্ণাঙ্গ দর্শন হিসেবে অদ্বৈতবাদ প্রধানত নবম শতাব্দীতে শংকরাচার্যের সৃষ্টি। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই নিরামিষ আহার এ দেশে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। উপরন্তু দার্শনিক অদ্বৈতবাদ ইউক্লিডের আয়তনহীন বিন্দুর মতই একটি কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র। ইউক্লিডের বিন্দুর মতই যুক্তিতে কিংবা আদর্শ হিসেবে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও বাস্তব সমাজজীবনে এর রূপায়ণ সম্ভব নয়। কারণ, প্রকৃত সমাজজীবন দ্বৈতরূপেই বিরাজমান, যেমন প্রতিটি বিন্দুই বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুটা আয়তন নিয়ে বিরাজ করে। শংকরাচার্যের মত অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তাও শিবস্তোত্র প্রভৃতি দ্বৈতভাবাপন্ন শাস্ত্র রচনা করেছেন, এবং প্রার্থনা, পূজা প্রভৃতির সমর্থক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য বহু অদ্বৈতবাদী সাধক কালী প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপের উপাসক ছিলেন। এ সবই দ্বৈতভাবের উদাহরণ, কারণ অদ্বৈতভাবে শিব ও জীব, শক্তি ও শাক্ত, উপাসক ও উপাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত অদ্বৈত দর্শনে এমনতর ভিন্ন ভিন্ন নামই সম্ভব নয়। তান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসীরা অদ্বৈতবাদী হয়েও সবরকম খাদ্য গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি প্রখ্যাত সাধক অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হলেও আমিষ খাদ্য গ্রহণ করতেন। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে সংশোধিত শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব অদ্বৈতবাদে আমিষ আহারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যায় যে, অদ্বৈতবাদ উত্তমাংশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দার্শনিকের জ্ঞানযোগের ফলশ্রুতি হিসেবে চিন্তা-জগতের এক সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাস্তব সমাজজীবনে স্বাভাবিক কারণেই এর কোন ঐতিহাসিক প্রতিফলন দেখা যায়নি। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্যকৃত 'সর্বদর্শন সংগ্রহে'র প্রথম অধ্যায়ে চার্বাক দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, নাস্তিকবাদ এবং পার্থিব ভোগবিলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দর্শনই জনসাধারণের প্রকৃত জীবনদর্শন এবং এই দর্শনের উচ্ছেদ সম্ভব নয় (দুরুচ্ছেদ্যং হি চার্বাকদর্শনম)। মাধবাচার্যের মতে আমজনতা এই দর্শনে বিশ্বাসী বলেই চার্বাক দর্শনের আরেক নাম লোকায়ত দর্শন। অতএব অদ্বৈত দর্শনের ভিত্তিতে সমগ্র সৃষ্টি চরাচরের সঙ্গে ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষ মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। যে বিরাট সাম্যময় বিশ্বচেতনার ফলে মানবেতর প্রাণীর প্রতি করুণায় মানবনেত্রে অশ্রুবিন্দুর অভ্যুদয় ঘটে, অকল্পনীয় সে মহান চেতনার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও এ দেশের সমাজজীবনে কোন কালে দেখা যায়নি। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ দেশের যে করুণাসিন্ধু মানুষ মাছ, এমন কি ডিম খেতেও অস্বীকার করেন, যাঁদের দাবিতে গণতান্ত্রিক সরকার ভারতের বহু স্থানে আইন করে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ করেছেন, তাঁরাই অপর জাতির হাতের রান্না কিংবা জল খেতে ঘৃণা বোধ করেন, হরিজন শিশুকে ভৌতিক উল্লাসে জীবন্ত

দগ্ধ করেন, আর ঔষধ এবং খাদ্যে বিষ মিশিয়ে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করেন। ভণ্ডামিই কি আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য?

প্রকৃতপক্ষে আমিষ খাদ্য অপবিত্র আর নিরামিষ খাদ্য পবিত্র, এই ধর্মীয় কুসংস্কারই এ দেশে নিরামিষ খাদ্যের বহুল প্রচলনের প্রধান কারণ। ঠিক কবে থেকে এই কুসংস্কার এ দেশে দানা বেঁধে উঠেছিল বলা শক্ত। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনু-সংহিতা এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে নিরামিষ ভোজনের কোন বিধান নেই। বরঞ্চ সবরকম খাদ্য গ্রহণই সে যুগে এ দেশে প্রচলিত রীতি ছিল। গুপ্তযুগ থেকেই সম্ভবত জাতি-ভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অন্যান্য কুসংস্কার জোরদার হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে পবিত্রতা-অপবিত্রতার তত্ত্বও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কালক্রমে উচ্চ জাতিদের অনুকরণে অনেক নীচ জাতিও নিরামিষ ভোজনের রীতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতা কিংবা আরনলড টয়েনবি যাকে Indic Civilization বলেছেন, সে সভ্যতায় খাদ্যাখাদ্যের পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কুসংস্কার ছিল না। পরবর্তী কালের হিন্দু কিংবা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাতেই এ কুসংস্কার দানা বেঁধে উঠেছিল।

এই কুসংস্কারের পেছনে আবার একটি অন্ধ বিশ্বাস কাজ করে। এবং তা হল এই যে, আমিষ খাদ্য কাম, ক্রোধ প্রভৃতি তমঃ গুণের বর্ধক, আর নিরামিষ খাদ্য সংযম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সত্ত্ব গুণের পরিপূরক। গান্ধীজীও এই মতের প্রচারক ছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, বিশুদ্ধ নিরামিষ আহার ব্যতীত ব্রহ্মচর্য কদাপি সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান খাদ্যের এমন কোন চরিত্র উৎপাদনী শক্তি স্বীকার করে না। খাদ্য সহজপাচ্য কিনা, শরীরের পুষ্টি ও শক্তির পক্ষে সহায়ক কিনা, তাই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিবেচ্য বিষয়, আর এ দু'দিক থেকেই আমিষ খাদ্য বিজ্ঞানের বিচারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। মহাত্মা গান্ধী আশৈশব বিশুদ্ধ নিরামিষাশী হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যৌবনে অতি মাত্রায় কামুক ছিলেন এ কথা তিনি নিজ আত্মজীবনীতেই লিখে গেছেন। আমিষ খাদ্য যে বিশেষভাবে কাম উৎপন্ন করে না, আর নিরামিষ খাদ্য যে মানুষকে নিষ্কাম করে না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিরামিষাশী ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার। এ দেশের মানুষের উৎপাদনী শক্তি যেন ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, অফিস-আদালত থেকে সরে এসে শয়ন-কক্ষেই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছে। আধুনিক ভারতবাসী কিংবদন্তীর ষাট হাজার সন্তানের জনক সগর রাজারই যিনি বংশধর। নিরামিষাশী ভারতবাসীদের মত কামাসক্ত এবং যৌনজীবনে উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আর ক্রোধের কথাই যদি ধরা যায়, ফলমূলাহারী প্রাচীন মুনিঋষিদের যখন-তখন অভিশাপ বর্ষণ থেকে শুরু করে বর্তমান ভারতে জমি নিয়ে খুনোখুনি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্যাপক রাজনৈতিক নরহত্যা ও ধ্বংসলীলা এবং হরিজন দাহ পর্যন্ত সবই বোধ হয় নিরামিষ ভোজনের সুফল। গভীর মহাবিশ্ব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ অতিমানব স্বাভাবিসিদ্ধ করুণায় প্রাণিহত্যা থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকতে পারেন। কিন্তু এ-হেন মহামানব কদাচিৎ আবির্ভূত হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের নিরামিষ ভোজন শুধুই দুর্মর কুসংস্কার প্রসূত।

অনেকে আবার খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্মীয় কুসংস্কারকে এই আপাতবৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেন যে, ট্রপিক্যাল বা গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুতে আমিষ ভোজন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এবং নিরামিষ ভোজনই উপকারী। এ যুক্তিরও প্রকৃতপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ট্রপিক্যাল জলবায়ুতে অল্প কাজে তুলনাক্রমে অধিক শারীরিক শক্তি ব্যয়িত হয় এবং ফলে শরীরের পুষ্টির জন্য শীতপ্রধান জলবায়ুর চেয়ে এ ধরনের জলবায়ুতেই প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। আর প্রধানত আমিষ খাদ্যই প্রোটিনের প্রয়োজন ভালোভাবে মেটাতে পারে। অতএব

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শীতপ্রধান জলবায়ুর চেয়ে গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুতেই আমিষ খাদ্যের প্রয়োজন বেশী।

এ দেশের আমিষভোজী মানুষের মধ্যেও খাদ্যবস্তুর পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধে কুসংস্কারের অভাব নেই। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাব নিয়ে তাঁরা আবার বিশেষ বিশেষ আমিষ খাদ্যকে অপবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। অনেক গোঁড়া হিন্দুর কাছে আজ অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে, বিশেষত বৈদিক ভারতবর্ষে, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কুসংস্কার আজকের চেয়ে অনেক কম ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বিভিন্ন বেদ, উপনিষদ, কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মনুসংহিতা, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রেই গরু খাবার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে বিভিন্ন ধরনের গরু বলি দেওয়া হত। গোমেধ যজ্ঞ ও মধুপর্ক অনুষ্ঠানে গোমাংস ভক্ষণ বহুল প্রচলিত ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মেধাবী পুত্রকামনায় দম্পতিকে ঘি, ভাত ও বৃষমাংস এক সঙ্গে রান্না করে খেতে বলা হয়েছে। চরকসংহিতায় বলিষ্ঠ সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে গর্ভবতী নারীদের গোমাংস খেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে চরক বলেছেন যে, গরু মহিষ ও শূকরের মাংস প্রতিদিনই ভোজন করা উচিত নয়। মনু-সংহিতায় একমাত্র উট ছাড়া এক পাটি দাঁতযুক্ত আর সব প্রাণীকেই খেতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্যই গরুও পড়ে। তা ছাড়া গণ্ডার ও অন্যান্য অনেক বন্য প্রাণী খেতে বলা হয়েছে যা আধুনিক হিন্দুরা শাস্ত্রমতে অখাদ্য জ্ঞান করেন। এমন যে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র, তিনিও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে মুনিবর গোবৎস হত্যা করে অতিথি সৎকার করেছিলেন। 'উত্তররামচরিতে' লেখা আছে যে, ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বাল্মীকি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট গোবৎসকে যেন নেকড়ে বাঘের মত খেয়ে ফেললেন। সঙ্গত কারণেই অতিথিকে সে যুগে বলা হত গোঘ্ন। পরবর্তী কালে কৃষিপ্রধান দেশের আর্থিক প্রয়োজনে গোহত্যা বন্ধ হয় এবং এ নিষেধকে শক্তিশালী করবার জন্যই গরুকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়। গোমাংস ভক্ষণের সহস্র উদাহরণ আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও নিজেদের হীনমন্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার প্রতি মৌলিক অশ্রদ্ধাবশত এ দেশের কুসংস্কারগ্রস্ত সংস্কৃত পণ্ডিতেরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ করে চলেছেন।

কিন্তু সে বিতর্ক নিরর্থক। প্রাচীন ভারতে গরু খাওয়া হত কিনা কিংবা মধ্য-যুগীয় আরব দেশে শূকর খাওয়া বারণ ছিল কিনা তা দ্বারা বর্তমান যুগের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাবে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাদ্যবিশেষ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা একমাত্র সে বিচারেই আধুনিক মননশীল মানুষের পক্ষে খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করা বিধেয়। সেদিক থেকে খাদ্যের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা সম্বন্ধে আমিষ-ভোজীদের প্রায় কোন কুসংস্কারই ধোপে টেঁকে না। এই প্রসঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না যে, একমাত্র হিন্দুরা ছাড়া পৃথিবীর আর সব দেশের সব মানুষই গরু খান এবং একমাত্র মুসলমানেরা ছাড়া পৃথিবীর আর সব মানুষই শূকর খান, যদিও তথা-কথিত উচ্চ জাতির হিন্দুরাও সাধারণত এ খাদ্য পরিহার করেন।

নিরামিষ আহার এক দিকে এ দেশের জনস্বাস্থ্যের বিপুল ক্ষতিসাধন করছে, আর অন্য দিকে খাদ্য সমস্যাকে তুলছে তীব্র করে। প্রোটিন খাদ্যের অভাবে শরীরের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, উপযুক্ত পুষ্টি হয় না এবং সাধারণ শক্তিহীনতা দেখা দেয়। ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ও উৎপাদনী শক্তি উভয়ই হ্রাস পায়। আর স্বাস্থ্যহীন জাতির পক্ষে দেশের দ্রুত উন্নয়ন এবং অপর দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইকাফের (বর্তমানে এসক্যাপ) গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রাচ্য জগতের মানুষের

চেহারায় তথাকথিত শান্ত ও সৌম্য ভাব প্রকৃতপক্ষে প্রোটিন খাদ্যের অভাবজনিত শারীরিক অপুষ্টিরই বাহ্যিক লক্ষণ। গুনার মিরডাল প্রমুখ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও এ তথ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ তথ্যের সত্যতা একদিন উপবাস করে আয়নায় মুখ দেখলেই সহজে বোঝা যায়। অন্যান্য প্রাচ্য দেশের চেয়ে ভারতের মানুষের প্রোটিন খাদ্যের পরিমাণ অনেক কম বলেই বোধ হয় তাদের চেহারায় শান্ত ও সৌম্য ভাব এত বেশী প্রবল।

আমিষ বর্জন কিংবা বিশেষ বিশেষ সহজলভ্য আমিষ খাদ্য পরিহার খাদ্য সমস্যাকে স্বভাবতই তীব্র করে তোলে। দুধ, ঘি, টাটকা এবং শুকনো ফল প্রভৃতি খাদ্যের মাধ্যমে প্রোটিন ও সাধারণ পুষ্টির অভাব পূরণ করা সম্ভব হলেও জনসাধারণের পক্ষে বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কারণ সমপরিমাণ পুষ্টির জন্য মাছ-মাংসের তুলনায় এসব খাদ্য অনেক বেশী পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়, আর অগ্নিমূল্য এসব দ্রব্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। একমাত্র ধনী নিরামিষাশীর পক্ষেই স্বাস্থ্য রক্ষা সম্ভব, কিন্তু তাঁরা আবার অতিরিক্ত দুধ-ঘি খাবার দরুন প্রায়ই মেদময়, বিপুলোদর এবং বিশালবপু হয়ে থাকেন। ফলে চাল, গম প্রভৃতির উপরই খাদ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার চাপ পড়ে এবং তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দেয়, আর অভাব ও অপুষ্টি একই সঙ্গে মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে তোলে। প্রোটিনযুক্ত আমিষ খাদ্যও আজকাল দুর্মূল্য, কিন্তু তথাপি তুলনাক্রমে কম মূল্যে পুষ্টির উপযোগী পরিমাণ ক্রয় কিংবা সংগ্রহ করা বহু লোকের পক্ষেই সম্ভব, বিশেষ করে বিভিন্ন সহজলভ্য প্রোটিন খাদ্য সম্বন্ধে যদি কোন কুসংস্কার না থাকে।

আমাদের প্রতিবেশী চীন দেশেও জনসংখ্যা বিপুল। কিন্তু সেখানে খাদ্য সমস্যা আমাদের দেশের মত তীব্র না হবার একটি প্রধান কারণ এই যে, কুসংস্কারবর্জিত মহা-চীনের মানুষ যে-কোন আমিষ খাদ্যই গ্রহণ করেন, এমন কি সাধারণ কীটপতঙ্গ থেকেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করেন। ফলে চাল-গমের উপর তাঁদের চাহিদার চাপ এ দেশের মত এত তীব্র আকার ধারণ করে না, আর জনস্বাস্থ্যও উন্নত হয়। খাদ্য সম্বন্ধে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এ দেশের মানুষের পক্ষে তাই চীনের জনগণের সঙ্গে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধন করতে হলে, দেশের আর্থিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে, আর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করতে হলে এ দেশের মানুষকে অবশ্যই খাদ্যের পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধে প্রাচীন কুসংস্কার বর্জন করে বিজ্ঞানভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস অচিরে আয়ত্ত করতে হবে।

॥ ৩ ॥

বিজ্ঞানবিরোধী পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণাবশত স্পর্শ সম্বন্ধে বহু অন্ধ কুসংস্কারও যুগযুগান্তর ধরে আমাদের মনের গহনে বাসা বেঁধেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুসংস্কার বোধ হয় এই যে, তথাকথিত নীচ জাতিদের স্পর্শ করলে তথাকথিত উচ্চ জাতিদের শরীর ও মন কলুষিত হয়। এই অবমানবীয় কুসংস্কারে ভর করেই এ দেশের বিশ্ববিখ্যাত ও বীভৎস অস্পৃশ্যতা প্রথা হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর কোটি কোটি মানুষকে রেখেছে পশুর চেয়েও অধম করে। তথাকথিত উচ্চ জাতির পাষণ্ড হিন্দুরা গরু, কুকুর, বেড়াল ও অন্যান্য পশুপক্ষীকে বিনা দ্বিধায় স্পর্শ ও আদর করেন, কিন্তু অপবিত্র হবার ভয়ে

কোটি কোটি মানবসন্তানকে স্পর্শ করেন না। এই স্পর্শ প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ হলেও বিপদ ঘটতে পারে। অর্থাৎ কোন নীচ জাতি যদি জল কিংবা খাদ্য স্পর্শ করেন এবং উচ্চ জাতি যদি সে জল কিংবা খাদ্য তারপর গ্রহণ করেন, তা হলেও স্পর্শদোষ থেকে অব্যাহতি নেই। অস্পৃশ্যতারই আরেক ভয়াবহ পৈশাচিক রূপ হল অনাগম্যতা বা কাছে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা, যার অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতেও ফাহিয়েন লক্ষ করেছিলেন। ভারতের অনেক জায়গায় আবার হরিজনদের উপর অদৃশ্যতা বিধি প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ উচ্চ জাতির লোকেরা তাদের চোখের সামনে আসতে নিষেধ করেন। ওড়িশ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরালা প্রভৃতি অনেক রাজ্যে হরিজনেরা এই নিয়মবশত রাত্রির অন্ধকারে কিংবা দিনের বেলা গলায় ঘণ্টা বেঁধে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। উচ্চ জাতিদের সঙ্গে এক রাস্তায় যাতায়াত করাও হরিজনদের নিষেধ, এবং এরকম সামাজিক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধেই ত্রিবাংকুর রাজ্যের বাইকমে ১৯২৪ সালে এক বিখ্যাত সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তা ছাড়া ভারতের সর্বত্রই হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা সর্বজনবিদিত (পাছে হরিজনদের স্পর্শে বা নৈকট্যে দেবতা অপবিত্র হন!), এবং এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আজীবন সংগ্রাম করেছেন, যদিও সে সংগ্রামের তীব্রতা সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে।

অস্পৃশ্যতা এবং তার চেয়েও ভয়ংকর এসব অমানুষিক আচার-বিচারের মূল কারণ এই অন্ধ কুসংস্কার যে, তথাকথিত নীচ জাতি বা ছোটলোকদের চরিত্র খারাপ, এবং তাদের স্পর্শ করলে, এমন কি সামনে পড়লে তথাকথিত উচ্চ জাতি বা ভদ্রলোকদের চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে। সত্ত্ব এবং রজঃ গুণের অধিকারী উচ্চ জাতির তমঃগুণাচ্ছন্ন শূদ্রদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে অধঃপতিত হবেন, এই ভয়েই তাঁরা দূরে সরে থাকবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত। তিন গুণের সমাহারে মানবচরিত্র নির্মিত কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। সমাজবিজ্ঞান কিংবা মনোবিজ্ঞান এ তত্ত্বকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলেই ঘোষণা করবে। তথাকথিত ছোটলোকদের চেয়ে তথাকথিত ভদ্রলোকদের চরিত্র ভালো কিনা সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে। অনেকে সংগত কারণেই বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু সবার উপরে সত্য এই যে, অপর কোন মানুষকে স্পর্শ করে, তার ছোঁয়া খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণ করে, অথবা তার দৃষ্টির সম্মুখে পড়লে কোন লোকের চরিত্র কিংবা ব্যক্তিত্বের অবনতি হতে পারে, এই ভয়াবহ কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এ-হেন ভয়ে যারা সন্ত্রস্ত, প্রকৃতপক্ষে তাদের চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব বলে কিছু আছে কিনা এ প্রশ্নই স্বাভাবিক।

ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত মানুষকে স্পর্শ করে কোন কোন ক্ষেত্রে শরীর রোগগ্রস্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তার সঙ্গে পবিত্রতা-অপবিত্রতা কিংবা চারিত্রিক গুণাগুণের কোন সম্বন্ধ নেই, জাতিগত আচার-বিচারের তো নয়ই। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানই এ ধরনের ছোঁয়াচে রোগের প্রসার বন্ধ করতে পারে। উচ্চ নীচ জাতির ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতার মাধ্যমে এর নিরোধ কিংবা প্রতিকার সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এ দেশের সমাজে সংক্রামক রোগের তুলনামূলক আধিক্যই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। নীরোগ কোন তথাকথিত অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করে উচ্চ জাতির লোক রোগাক্রান্ত হয়েছেন, এমন কোন উদাহরণ নিশ্চয়ই কারও জানা নেই। অপর পক্ষে, রোগগ্রস্ত উচ্চ জাতির লোককে স্পর্শ করে নীরোগ নিম্ন জাতির লোকের পক্ষে রোগাক্রান্ত হওয়া খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে অতিভোজন বা অবৈজ্ঞানিক ভোজন, শ্রমবিমুখতা ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ফলেই উচ্চ জাতির লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত হন। তুলনাক্রমে তথাকথিত নিম্ন জাতির লোকেরা খাদ্যাভাব এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন যাপনের ফলেই রোগের কবলে পতিত হয়ে থাকেন।

চরিত্রশুদ্ধি উচ্চ জাতিদের জন্যই বেশী প্রয়োজন। নিম্ন জাতিদের জন্য যা প্রয়োজন তা হল সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশের ক্রান্তিকারী পরিবর্তন, জীবনমানের উন্নয়ন, জাতীয় সম্পদের পুনর্বণ্টন, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং জনস্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন।

স্পর্শ সম্বন্ধে কুসংস্কার শুধু যে মানুষস্পর্শেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। বিভিন্ন দ্রব্যের কাল্পনিক পবিত্রতা কিংবা অপবিত্রতা অনুযায়ী স্পর্শের আইন তাদের প্রতিও প্রযোজ্য। আমিষ খাদ্যে চরিত্র পতনের ভয়ে যাঁরা ভীত, তাঁরা এরকম খাদ্য স্পর্শ করতেও আপত্তি করেন। এ দেশের একান্নবর্তী আমিষভোজী পরিবারের বিধবাদের প্রধানত ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে আমিষ আহার নিষিদ্ধ। অসহায় বিধবা মহিলারা শুধু যে এ অত্যাচার নীরবে মেনে নিয়েছেন তাই নয়, কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অপবিত্রতার ভয়ে তাঁরা দৈবাৎ আমিষ বস্তু স্পর্শ করলে, এমন কি যে টেবিলে আমিষ আহার হয় সে টেবিল স্পর্শ করলে, স্নান করে পবিত্র হবার চেষ্টা করেন। মানুষের মলমূত্র অবশ্যই অপবিত্র গণ্য হয়, কিন্তু বড় রাস্তায়, অপরের জমিতে কিংবা অপরের বাড়ির সামনে মলমূত্র ত্যাগ করা কোন অপবিত্র কাজ নয়। নিজ বাড়ির মধ্যেও এ দেশের খুব কম পরিবারেই বাথরুম পরিচ্ছন্ন থাকে। এদিকে গরুর মলমূত্রের মত পবিত্র জিনিস হিন্দু শাস্ত্র মতে আর কিছুই নেই। পুজো-পার্বণ, স্নান-আচমন, প্রায়শ্চিত্ত, এমন কি পান ও আহারের জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারেরা গোবর ও চোনা বিশেষভাবে রেকমেণ্ড করেছেন। এই কুসংস্কার এতই গভীর যে, অনেক উচ্চশিক্ষিত আধুনিক হিন্দুকে এই উদ্ভট তত্ত্ব প্রচার করতে শোনা যায় যে, গোবরে মানবস্বাস্থ্যের পরিপূরক অনেক রাসায়নিক উপাদান আছে। আবার শুয়োর, ঘোড়া প্রভৃতি অন্যান্য জীবজন্তুর মলমূত্র অপবিত্র। কয়েক শ' বছর আগে থেকেই চীন ও জাপানে মানুষ ও শুয়োরের মল ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরাশক্তি ভারতের চেয়ে অনেক বেশী। আর ভারতবাসীরা এসব অপবিত্র দ্রব্য জমিতে ব্যবহার করতে অস্বীকার করে বহুকাল ধরেই কৃষি উৎপাদনে প্রায় সব দেশের পেছনে পড়ে আছে।

॥ ৪ ॥

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যেই পৃথিবীর মানুষ এক দিকে আভ্যন্তরীণ আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি করে চলেছে, আর অন্যদিকে মহাবিশ্বের লোকে লোকান্তরে জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে। আভ্যন্তরীণ বিকাশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফলকাম হতে হলে ভারতবর্ষকেও বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর এ বিজ্ঞানসাধনার প্রথম সোপান হল সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন। সেদিক থেকে হাজার কুসংস্কারে প্রতিষ্ঠিত রক্ত, জীবকোষ ও প্রকৃতিগত পবিত্রতার ধারণা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, অনাগম্যতা, অদৃশ্যতা এবং বিভিন্ন খাদ্যাখাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা আর সাধারণ শুচিবাই বিজ্ঞান-ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এবং অতএব ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতি তথা আন্তর্জাতিক সফলতার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। কুসংস্কারের এ মায়াজাল ছিন্ন করতে না পারলে কোন দিকেই ভারতের অগ্রগতি সম্ভব নয়। খর্বকায়, শীর্ণদেহ, জীবনীশক্তিহীন আমরা যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থের বিয়ে হলে ব্রাহ্মণ পরিবার অপবিত্র হয় কিনা, এক কুয়ো থেকে উচ্চ জাতি ও নীচ জাতি জল তুললে উচ্চ জাতির জৈবিক ও চারিত্রিক অধঃপতন হয় কিনা, ডিম খেলে তমঃ গুণ বৃদ্ধি পায় কিনা, আর

মাছ-খাওয়া টেবিল ছুঁলে বিধবার স্নান করা উচিত কিনা এসব বিচারে সময় কাটাব, বাইরের পৃথিবীর মানুষ তখন গ্রহান্তরে বসতি স্থাপন করবে। আর ধর্মপ্রাণ আমরা ছুঁতমার্গ আশ্রয় করে যুগ যুগ ধরে তাদের কাছে অর্থ আর অন্ন ভিক্ষা করে নিজেদের পবিত্রতা বজায় রাখব।

ব্যবহারিক ধর্ম প্রসূত অন্ধ কুসংস্কার ধ্বংস করে আমজনতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ব্যাপক বিজ্ঞানভিত্তিক জনশিক্ষা। কিন্তু কেবলমাত্র জনশিক্ষার মাধ্যমে সমাজজীবনের গভীর কুসংস্কারগুলিকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষ, এমন কি বৈজ্ঞানিক জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, খাদ্যাখাদ্যের পবিত্রতা-অপবিত্রতা প্রভৃতি কুসংস্কার অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন। বিশেষত এ দেশের নারীসমাজে বিজ্ঞান-বিরোধী পবিত্রতা-অপবিত্রতার জ্ঞান এবং সাধারণ শুচিবাই অত্যন্ত প্রবল। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা যত শিক্ষিতই হোন না কেন। অতএব ব্যাপক বিজ্ঞানধর্মী লোকশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন এক বিরাট সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সে বিপ্লবের বন্যা একই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ধর্ম, জাতিভেদ-শ্রেণীভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য সমস্ত অন্ধ কুসংস্কার। বহুযুগসঞ্চিত ধর্মীয় কুসংস্কারের ভগ্নস্তূপের উপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে বিজ্ঞানের। আমাদের অন্ধকার মুমূর্ষু জীবনে ঘটবে নূতন আলোর সঞ্চার আর বিরাট শক্তির প্রকাশ। পেছিয়ে পড়া এই হতভাগ্য ভারতের পতাকা সেদিন ইতিহাসের মিছিলের প্রথম সারিতে উড়বে।

শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদ

সাম্য ও স্বাধীনতা এযুগে মানব সভ্যতার মূলমন্ত্র। শ্রেণী বৈষম্যের প্রতিবাদে লক্ষ কোটি মানুষ তাই আজ পৃথিবীর দিকে দিকে সোচ্চার। গণশক্তির এ দুর্বার অভিযানের গতিরোধ করবার হিম্মত কোন দানবীয় শক্তিই ধারণ করে না। শ্রেণীভেদকে দ্রুত অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাওয়া সংগত কিনা, এ প্রশ্ন অতীতের। এই অবলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করবার এবং প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতার বিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা কোন্‌টি, শুধু এ প্রশ্নই বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ভারতবর্ষ যদি ইতিহাসের এই মুখর মিছিলে অন্য দেশের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে না যায়, বহুধা বিন্যস্ত সমাজকে যদি এদেশের আমজনতা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতার আধার করে গড়ে না তোলে, তবে ইতিহাস আবারও এ হতভাগ্য দেশকে বর্জিত সৃষ্টির মত পেছনে ফেলে আপন গতিতে এগিয়ে চলবে।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞান যৌথ সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থাৎ যৌথ মর্যাদা বা অমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সামাজিক স্তর বা গোষ্ঠীকেই শ্রেণী আখ্যা দেয়। কিন্তু বাস্তব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে শ্রেণীবিন্যাস বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। ইউরোপে সামাজিক স্তরভেদ এদেশের মত বহুমুখী ও প্রকট ছিল না বলে আর্থিক বুনিয়াদকে ভিত্তি করেই শ্রেণীভেদ জন্মলাভ করেছিল। প্রধানত জমি এবং পুঁজির মালিকানার ভিত্তিতেই ইউরোপে শোষক এবং শোষিতের ব্যবধান আর সেই সঙ্গে শ্রেণীসংঘাত দানা বেঁধে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদিপর্বে শ্রেণী সংঘাতের স্বরূপ ছিল স্বতন্ত্র। সে দেশের আদিবাসী, যৌথ মালিকানায় বিশ্বাসী, লক্ষ লক্ষ তথাকথিত রেড ইন্ডিয়ানদের নিধনযজ্ঞের মাধ্যমেই ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা সে দেশে কৃষি ও শিল্পে পুঁজিবাদের গোড়া পত্তন করে। তারপর লোহার শেকলে বেঁধে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পশুবলে ক্রীতদাস রূপে ধরে নিয়ে আসে পাশ্চাত্য সভ্যতার নয়া পীঠস্থানের আর্থিক বুনিয়াদ রচনার উদ্দেশ্যে। এ দুই ক্ষেত্রেই আর্থিক উদ্দেশ্য প্রবল হলেও নিপীড়িত শ্রেণী প্রধানত শিকার হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির এবং অন্ধ বর্ণবিদ্বেষের। আর্থিক বুনিয়াদের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি হিসেবে এখানে শ্রেণীভেদের উৎপত্তি হয়নি। আজও মার্কিন দেশে কৃষ্ণকায় এবং রেড ইন্ডিয়ানদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে যদিও এ শ্রেণীভেদ সম্পর্কহীন নয়, তথাপি ইউরোপাগত শ্বেতাঙ্গদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক উৎপীড়নই কালো এবং লাল অধিবাসীদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। দরিদ্র মেহনতী শ্বেতাঙ্গও কালো এবং লালদের ঘৃণা আর সুযোগ পেলে অত্যাচার করে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিবর্তনের

মাধ্যমে পরবর্তীকালে অবশ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আর্থিক শ্রেণীভেদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু, শুধুমাত্র আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমেরিকায় শ্রেণীভেদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও নবাগত এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ ইউরোপীয়দের রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদি-বাসীরা বিরাট এক উৎপীড়িত এবং শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। এই শ্রেণী-বৈষম্যেরও নিঃসন্দেহে আর্থিক তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনীতির বিচারে এই বহুমুখী শোষণশাসনকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রাচীন ভারতে শ্রেণীভেদের উৎপত্তি হয়েছিল অনেকটা আধুনিক কালে আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতেই। আগ্রাসী আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিল তিনটি শ্রেণী নিয়ে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুটি ছিল প্রধান শ্রেণী, আর বৈশ্যরা ছিল তুলনাক্রমে অপ্রধান তৃতীয় শ্রেণী। এদেশের অধিবাসীদের বাহুবলে পরাস্ত করে তারা দাস কিংবা শূদ্র শ্রেণীতে পরিণত করে। বহিরাগত প্রথম তিন শ্রেণীর সঙ্গে এদেশের শূদ্রদের মৌলিক প্রভেদ প্রাথমিক পর্যায়ে গায়ের রঙের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্বেতবর্ণ আর্যরা এদেশের বিজিত এবং তুলনাক্রমে কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রদের অনাদরে দূরে ঠেলে দিল। দেশের প্রকৃত অধিবাসী এবং জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হল। কালক্রমে 'অপবিত্র' কাজে নিযুক্ত শূদ্রদের এক অংশ 'অস্পৃশ্য' শ্রেণীতে পরিণত হল। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এদের সাধারণত 'পঞ্চম' আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এদের সামাজিক মর্যাদা ও স্থান এতই হীন ছিল যে, অনেক শাস্ত্রকার এদের বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত গণ্য করতেন এবং 'পঞ্চম' উপাধির সম্মান দিতেও অস্বীকার করতেন। এভাবে বৈদিক যুগের শেষদিকে ভারতবর্ষে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের গোড়াপত্তন হয়। আর ভারতের যেসব আদিম অধিবাসী আর্যসভ্যতার বশ্যতা স্বীকার না করে কিংবা আর্যদের সংস্পর্শে না এসে অরণ্যে পর্বতে বাস করতে লাগল, বর্তমান কালে তারাই আদিবাসী নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তারা বর্ণভেদ প্রথার বাইরে থেকে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও কার্যত এদেরও অস্পৃশ্যদের সমগোত্রীয় করে সমাজের একেবারে নীচের তলায় ঠেলে দেয়া হল। বানভট্ট রচিত কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে আদিবাসীদের এই হীনস্থান সহজেই চোখে পড়ে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বৈদিক যুগের শেষভাগেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সংখ্যালঘু এই তিন শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্র, অস্পৃশ্য ও আদিবাসীদের সম্পূর্ণ পদানত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই শ্রেণীভেদ আদিতে সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তন ও বিকাশের মাধ্যমে হয়নি। শ্বেতবর্ণ আর্যরা অশ্বেতবর্ণ ভারতীয়দের বাহুবলে জয় করে বর্ণ ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ভিত্তিতেই প্রথমে শ্রেণীভেদের প্রবর্তন করে। কিন্তু কালক্রমে পেশাগত বৈষম্যের ভিত্তিতে এবং রাজনৈতিক ও আর্থিক শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে এদেশে শ্রেণীভেদ নবকলেবর ধারণ করে। বাহুবলে পরাক্রান্ত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়রা নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য অর্থের তাগিদে বৈশ্যদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। বৈশ্যরা নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্য ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য এবং নিজেদের শোষণ বজায় রাখবার জন্য ক্ষত্রিয়দের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর ব্রাহ্মণশ্রেণী নিজেদের জীবিকা নির্বাহ, শ্রীবৃদ্ধি এবং পরগাছাসুলভ শ্রেণীচরিত্র বজায় রাখবার জন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয় শ্রেণীর উপরই নির্ভরশীল হয়ে তাদের শ্রেণী-স্বার্থের হাতিয়ার রূপে কাজ করে। প্রথমেই তারা বহু শাস্ত্র রচনা করে এই অনুশাসন জারি করে যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণশ্রেণীর উচ্চস্থান ও শোষণশাসনের বিশেষ অধিকার মানুষের কিংবা সমাজের সৃষ্টি নয়, ঈশ্বরদত্ত জন্মগত অধিকার, এবং তাদের

শ্রেণীশোষণকে চ্যালেঞ্জ করবার অধিকার কোন মানুষের নেই, শূদ্রদের তো নয়ই। মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে এই লোকঠকানো তত্ত্বই জোর গলায় প্রচার করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি গরিষ্ঠ সংখ্যক শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের শোষিতের ভূমিকা, হীনস্থান এবং আজন্ম দাসত্বকেও প্রতিকারহীন ঈশ্বরদত্ত অবস্থা বলে ঘোষণা করেছে। ব্রাহ্মণশ্রেণীর এই ভূমিকা ক্ষত্রিয়শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং বৈশ্যশ্রেণীর কায়েমী আর্থিক স্বার্থকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে বলে এই দুই শ্রেণী শুধু যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের সুযোগপন্থী শ্রেণীচরিত্রকে রক্ষা করেছে তাই নয়, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রবাক্যকে অকাট্য বলে ঘোষণা করে এবং তাদের কৃত্রিম সম্মান দেখিয়ে সমাজের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণী আমজনতার উপর শোষণ-শাসন চিরায়ত করেছে, এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচার আর আর্থিক শোষণ সম্বন্ধে মেহনতী মানুষকে খামোশ থাকতে বাধ্য করেছে।

বহুবিধ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঘটনাপ্রবাহ ও বিবর্তনের স্রোতে কালক্রমে এই শ্রেণীভেদ এদেশে শত সহস্র স্তরে বিভক্ত জাতিভেদে পর্যবসিত হয়। কেবলমাত্র শ্রেণীসংকর কিংবা আর্থিক অথবা ধর্মীয় কারণে এই বিচিত্র জাতিভেদ প্রথা চক্রবৃদ্ধি হারে গড়ে ওঠেনি। বহু জটিল এবং মিশ্র কারণেই ভারতীয় সমাজের এই অবাক বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এবং জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জে এইচ হাটন তাঁর Caste in India গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা-লব্ধ কারণগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কারণগুলি নিম্নরূপ:— (১) ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা; (২) খাদ্যের মাধ্যমে চরিত্রগত গুণাগুণ প্রসার সম্বন্ধে আদিম সংস্কার; (৩) টোটেম, নিষিদ্ধ আচার অনুষ্ঠান, মানুষের শরীর-মন-আত্মা সম্বন্ধে আদিম ধারণা; (৪) পবিত্রতা-অপবিত্রতা, আচমন-অবগাহন, শুদ্ধি এবং যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা সম্বন্ধে সংস্কার; (৫) আত্মকেন্দ্রিক পরিবার, পূর্বপুরুষের পূজা এবং আনুষ্ঠানিক আহারের সংস্কার; (৬) জন্মান্তর এবং কর্মফল তত্ত্বে বিশ্বাস; (৭) পেশা ও কার্য সম্বন্ধে যাদু বা ইন্দ্রজালে বিশ্বাস; (৮) বংশানুক্রমিক বৃত্তি তথা বাণিজ্য ও পেশা সম্বন্ধে গুপ্তবিদ্যা; (৯) বৃত্তিগত ও পেশাগত যৌথ সংগঠন এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান; (১০) বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি, বিশেষত মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির সংঘাত; (১১) জাতিসংঘাত, বর্ণবিদ্বেষ ও বিজয়প্রসূত অধিকার; (১২) স্বতন্ত্র ধর্মীয় এবং সামাজিক সুযোগসুবিধাভোগী নূতন নূতন শ্রেণীর উদ্ভব; (১৩) বিভিন্ন উপজাতি ও জনপদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রসূত বিচ্ছিন্নতা; (১৪) স্বেচ্ছাকৃত অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি; (১৫) সুচতুর ও স্বার্থান্বেষী শ্রেণীদের দ্বারা আমজনতার পক্ষে দুর্বোধ্য ধর্মীয় দর্শন প্রতিষ্ঠা।

সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণাপ্রসূত হাটনের এই বিশ্লেষণ থেকে এ সত্য সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা প্রাচীন শ্রেণীভেদের মধ্য থেকে এক আদি ও অকৃত্রিম তরিকায় উদ্ভূত, যা নাকি পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন দেশের সমাজ ব্যবস্থা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র এবং বহুগুণে বিচিত্র। সমাজবিজ্ঞানে শ্রেণী শব্দের যে অর্থ আগে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা এদেশের জাতিভেদকেও শ্রেণীভেদ আখ্যা দিতে হয়, কেননা জাতিভেদও মূল্যায়িত সামাজিক স্তরভেদ ও মর্যাদাজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্য কোন দেশের, বিশেষত পাশ্চাত্ত্য দেশের শ্রেণীভেদের সঙ্গে

এই ভারতীয় শ্রেণীভেদের আসমান-জমিন পার্থক্য। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রমুখ দুয়েকটি দেশ ছাড়া সর্বত্রই প্রধানত তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যথা বুর্জোয়া, প্রোলিতারিয়েত এবং পাতি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু এদেশে জাতিভেদ প্রথার অভ্যন্তরে শত শত, এমন কি সহস্র সহস্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পূর্বে আলোচিত কয়েকটি দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে শ্রেণীভেদ প্রধানত আর্থিক বিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। কিন্তু এদেশের বহুরূপী শ্রেণীভেদ বহু যুগের মিশ্র ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি। তৃতীয়ত, পৃথিবীর অন্যত্র শ্রেণীভেদ বংশানুক্রমিকভাবে চিরস্থায়ী অচলায়তনের রূপ নেয়নি। আজকের প্রোলিতারিয়েতের পক্ষে আগামী দিনের পাতি বুর্জোয়া কিংবা বুর্জোয়া হতে কোন সামাজিক বাধা নেই, যদিও আর্থিক কারণে তা কঠিন হতে পারে। এদেশে শ্রেণীভেদ বংশানুক্রমিক ও জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী। চতুর্থত, অন্যত্র বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কোন সামাজিক বাধানিষেধ নেই, যদিও দরিদ্রের পক্ষে ধনীর সঙ্গে বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যত দুরূহ হতে পারে। অপরপক্ষে এদেশে নিজ জাতি বা শ্রেণীর বাইরে বিবাহ নিষিদ্ধকরণের ভিত্তিতেই শ্রেণীভেদপ্রথা মৌলিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি জাতি নামক ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহই জাতিভেদ প্রথার প্রধান মানদণ্ড। পরিশেষে, অন্যদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক আদানপ্রদান, ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত কোন বাধানিষেধ নেই, এবং শুচি-অশুচির কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এদেশে এসব বাধানিষেধকে কেন্দ্র করেই শ্রেণীভেদ দাঁড়িয়ে আছে এবং পবিত্র ও অপবিত্রের নারকীয় বৈষম্যের ভিত্তিতে উচ্চনীচ ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে; বিশেষত, কোটি কোটি মানুষকে অস্পৃশ্য করে রেখেছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে শ্রেণীভেদ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র ও অভিনব, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের শ্রেণীভেদের সঙ্গে এর বিশেষ কোন মিল নেই। এ সিদ্ধান্তও অনিবার্য হয়ে পড়ে যে শ্রেণীভেদ বিরোধী আন্দোলন এদেশে নতুন ধারায় গড়ে তোলা এবং পরিচালিত করা অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা এদেশের বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের আন্দোলনের সাফল্য সুদূরপরাহত। আগেই বলা হয়েছে যে, এদেশের শ্রেণীভেদ প্রথার উৎপত্তিতে কোন অর্থনৈতিক উপকরণ নেই এমন নয়। আদিবাসী, অস্পৃশ্য, এমন কি শূদ্র শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর মানুষ কদাচিৎ বিত্তবান কিংবা উচ্চশিক্ষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের শ্রেণীভেদের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ শুধুমাত্র আর্থিক বিবর্তন ও বিকাশের ফলশ্রুতি নয়। আরও বহুগুণে জটিলতর এবং বহু রূপে বিচিত্র কারণ সমাবেশের জটিল ঐতিহাসিক পরিণতি। অতএব ভারতজাত এই সৃষ্টিছাড়া শ্রেণীভেদ ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রে সীমিত শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যারা এই বিজাতীয় পদ্ধতিতে এদেশে শ্রেণীসংগ্রামে প্রয়াসী, তারা প্রধানত তিন আর্থিক শ্রেণীতে বিভক্ত পাশ্চাত্ত্য সমাজে উদ্ভূত শ্রেণীতত্ত্বের এদেশের জটিলতর সামাজিক পরিস্থিতিতে অতিসরল প্রয়োগ করছেন মাত্র।

॥ ২ ॥

ভারতে শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ণয় করতে হলে অতএব জাতিভেদ চেতনা ও তার কুফলের বহুমুখী প্রকাশের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই হতভাগ্য দেশে আজও এ আলোচনা করতে হয় বলে লেখনী শরমে মন্থর হয়ে আসে, গতিবেগ চঞ্চল বাইরের

পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নিজেদের প্রতি ঘৃণা বাঁধন মানতে চায় না। কিন্তু যে নারকীয় বীভৎসতায় জাতিভেদ আজও এদেশের জৈবিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে কলুষিত করছে, এবং ইতিহাসের পথের ধারে জগদ্দল পাথরের মত ভারতবর্ষকে ফেলে রেখেছে, নিজেদের লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে সে ভীষণ সত্যকে চোখের সামনে বার বার তুলে না ধরলে অনিবার্য অবক্ষয় থেকে আমাদের পরিত্রাণ কোথায়? আত্মপরিচয় না জেনে আত্মরক্ষা কিংবা আত্মোন্নতি যে সম্ভব নয়।

এদেশের মানুষের অন্ধ বিশ্বাস যে তাদের নিজেদের রক্তে জাতিগত চারিত্রিক গুণাগুণ এবং তথাকথিত পবিত্রতা সুপ্ত আছে, আর এসব বৈশিষ্ট্য স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সংরক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। অথচ আধুনিক জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এ তত্ত্বকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কল্পনা বলে ঘোষণা করেছে। জীবকোষের বংশানুক্রমিক সঞ্চারে শারীরিক আকার-প্রকার অনেকাংশে নির্ধারিত হয় সত্য, কিন্তু মানবের মননশীলতা কিংবা চারিত্রিক গুণাগুণের সঙ্গে জীবকোষ কিংবা রক্তের কোনই সম্বন্ধ নেই। সামাজিক পরিবেশ থেকেই আশৈশব মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সামাজিক পরিবেশের বাইরে থাকলে শুধুমাত্র রক্ত কিংবা জীবকোষের গুণে মনুষ্য শিশুর মনুষ্যত্বই সৃষ্টি হয় না, সে শুধু অর্ধচেতন অবমানবীয় পর্যায়ে পড়ে থাকে, জীববিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় এরূপ অনেক অকাট্য উদাহরণ পাওয়া গেছে। পরন্তু, পরিপূরক সামাজিক পরিবেশে যেকোন সুস্থ মানবশিশুই উন্নত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী হতে পারে, এ সত্য বহু গবেষণার ফলে সমাজবিজ্ঞানে আজ স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে রক্ত ও জীবকোষের সুদূরপ্রসারী সংমিশ্রণেই মানবের জৈবিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়, বিজ্ঞানসিদ্ধ এ সত্য আজ জীববিজ্ঞানে সন্দেহাতীত রূপে গৃহীত হয়েছে। সেদিক থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম জাতির মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ রেখে হিন্দু সমাজ অনিবার্য জৈবিক অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। অন্ধ কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত জাতি চেতনার বশবর্তী হয়ে নিজের রক্তেই স্বেচ্ছায় ধ্বংসের বীজ বপন করছে।

ভারতের রাজনৈতিক বাতাবরণেও জাতিভেদ জহর ছড়িয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং পরিবারকেন্দ্রিক চেতনাকে বৃহত্তর এবং সমষ্টিগত সামাজিক চেতনায় রূপান্তরই যেকোন দেশের রাজনৈতিক বিকাশের প্রথম সোপান। কিন্তু এদেশে নিজ পরিবারের বাইরে একমাত্র তথাকথিত স্বজাতির প্রতি ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তিমানুষের আনুগত্য কোন কালেই গড়ে ওঠেনি। স্বজাতি চেতনার ঊর্ধ্বে কোন বৃহত্তর সামাজিক চেতনা এদেশের মানুষের মনে কখনও স্থান পায়নি। ইংরেজী nation শব্দটির অনুবাদ ভারতীয় ভাষায় 'জাতি' করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতি বলতে এদেশে caste বোঝাত; nation শব্দের কোন পরিভাষা এদেশে নেই। কারণ এরকম কোন সামগ্রিক সমাজগোষ্ঠীর চেতনা এদেশে কোন কালেও ছিল না। ইতিহাসের আদিকাল থেকে এদেশের মানুষের সংকীর্ণ এবং সীমিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরেছে। আধুনিক রাজনৈতিক বিকাশের মৌলিক পরিবেশ কখনো রচিত হয়নি। এমনি কি স্বাধীন ভারতে ছাব্বিশ বৎসরের গণতান্ত্রিক কোলাহলের পরও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দিল্লীর পার্লামেন্ট পর্যন্ত সর্বস্তরেই নির্বাচন এবং দলীয় রাজনীতি জাতিভেদকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়, অন্য কোন স্থানীয় অভিজ্ঞতা এই সাধারণ পরিস্থিতির ব্যতিক্রম মাত্র। আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ায়, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গজদন্ত মিনারে বসে এক ধরনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলতে শুরু করেছেন যে জাতিভেদভিত্তিক রাজনীতি ভারতে সাম্য ও স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। উদাহরণস্বরূপ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

প্রধান অধ্যাপক ডঃ রুডলফ্ তাঁর The Modernity of Tradition নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, শত সহস্র জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক ধরনের সমন্বয়ধর্মী স্বাধীনতা ও সাম্য ভারতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এসব গণ্ডূষমাত্র জলের সফরীরা এও বোঝেন না যে, বংশানুক্রমিক ধারায় অধিষ্ঠিত এবং অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষণের ফলশ্রুতি যে আধা-সফল গণতন্ত্র এদেশে রচিত হচ্ছে, তার গভীরে কোন মানবিক মূল্যবোধ নেই, এবং অতএব প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতার কোন মৌলিক চেতনা নেই। মানবতাবাদী এবং যুক্তিধর্মী সর্বজনীন গণতন্ত্রের সঙ্গে এহেন গণতন্ত্রের কোন তুলনা হয় না।

জাতিভেদের অচলায়তনের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক কিংবা মানবীয় অধিকারের তত্ত্বও এদেশে কখনো গড়ে ওঠেনি। উচ্চ শ্রেণীদের দ্বারা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত সমাজদর্শন শূদ্র, অস্পৃশ্য ও আদিবাসী প্রমুখ জনসংখ্যার বিপুল গরিষ্ঠ অংশকে চিরদিন তাদের দাস করে রেখেছে, এবং কোন রাজনৈতিক কিংবা মানবিক অধিকারের কল্পনা তাদের মনে স্থান পেতে দেয়নি। অহর্নিশি শোষণযন্ত্রের মধ্যে নিরন্তর পরিশ্রমে জীবনীশক্তি তিলে তিলে ক্ষয় করে অযুত নিযুত মানুষ তাদের সমস্ত জীবনকে শুধু খরচের খাতায়ই লিখে রেখে গেছে। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কোন ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান তো দূরের কথা, সে কল্পনাও তাদের মনে কখনও স্থান পায়নি। চেতনাহীন, শক্তিহীন অগণিত শোষিত মানুষ এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চিরদিন দুর্বল ও ভংগুর করে রেখেছে। একদিকে আভ্যন্তরিক স্বৈরাচার ও দমননীতির ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে, আর অন্যদিকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণের মুখে জনসমর্থনহীন দুর্বল ক্ষত্রিয়কুল সহজে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। শ্রেণীগত পেশা এবং কর্মফলের তত্ত্ব এই ট্র্যাডিশনকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। নবযুগের গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতায় আজ এদেশে গণতান্ত্রিক আত্মচেতনার কিঞ্চিৎ উন্মেষ হয়েছে সত্যি, কিন্তু যুগ যুগান্তর ধরে গড়ে ওঠা জাতিভেদ তত্ত্ব ও অন্ধ কুসংস্কার সম্পূর্ণ অবলুপ্ত না হলে প্রকৃত ক্রান্তিকারী গণচেতনা এদেশে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

এদেশের আর্থিক বিকাশকেও যুগ যুগ ধরে স্তব্ধ করে রেখেছিল জাতিভেদ প্রথা। জাতিগোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ বংশানুক্রমিক বৃত্তি কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞানকে অচল করে রেখেছিল। প্রতিযোগিতা এবং সমষ্টিগত উদ্যমের মাধ্যমে যেসব নূতন নূতন আবিষ্কার আর কৃষি ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ পাশ্চাত্ত্য জগতে আর্থিক বুনিয়াদের রূপান্তর ঘটিয়েছে, এদেশে সে বহুমুখী প্রয়াস জাতিগত বৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কখনো বিকাশ লাভ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, শ্রমের যে সঞ্চরণশীলতা থেকে সামাজিক ও আর্থিক উদ্যম সৃষ্টি হয়, তা জাতিরূপী শ্রেণীগুলোর সামাজিক বেড়া ডিঙিয়ে এদেশে কোনদিনই বিস্তার লাভ করতে পারেনি। ভৌগোলিক ও বৃত্তিগত, এই উভয় দিক থেকেই শ্রমের সঞ্চরণশীলতা জাতিভেদের ফলে ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ম্যাকস্ ওয়েবার প্রমুখ অনেক সমাজবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে প্রধানত এই দুই কারণেই ইউরোপের মত শিল্প বিপ্লব এদেশে হয়নি, যদিও শিল্প বিপ্লবের আগে আর্থিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষ ইউরোপের ভয়ে পিছিয়ে ছিল না। স্বাধীন ভারতবর্ষে বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র অর্থব্যবস্থার আশু অবলুপ্তি ঘটবে, এ আশা অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, আর্থিক উন্নয়ন জাতিভেদের অবলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করতে পারেনি, বরঞ্চ জাতিভেদই অনেকাংশে আর্থিক প্রগতিকে প্রতিহত করেছে। গ্রামে গঞ্জে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক স্বার্থান্বেষী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থানীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে, এবং সামূহিক বিকাশ যোজনা, পঞ্চায়েতী রাজ, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি সমস্ত যৌথ প্রয়াসকে বহুলাংশে

ব্যর্থ করেছে। গুনার মিরডাল প্রমুখ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ ভারতে জাতিভেদের এই আর্থিক কুফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমজনতার এই ভ্রান্ত ও বিপথগামী জাতিচেতনা যে সমাজের আর্থিক শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়, এই পরিস্থিতি থেকে তা সহজেই প্রমাণ হয়। কারণ এই আর্থিক পর্যায়ভুক্ত এমন কি একই পেশাভুক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলিও পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত আছে। ভারতবর্ষ দুটি জিনিসের জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত। একটি জাতিভেদ প্রথা, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও নেই, আরেকটি তার চরম দারিদ্র্য। এ দুয়ের সহাবস্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এদের ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

সাংস্কৃতিক দরিয়ার স্রোতও জাতিভেদের সহস্র আবর্তে আবদ্ধ হয়ে আপন গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছে। একদিকে তথাকথিত উচ্চ জাতির ধূর্ত প্রবক্তারা জীবকে ব্রহ্ম বলে ঘোষণা করেছে। আবার একই সঙ্গে এই সব ভণ্ড, নীচাশয়, দুরাত্মা ও পাপিষ্ঠ জালিমেরা লক্ষ কোটি মানুষকে স্পর্শ করতে, একাসনে বসাতে, একসঙ্গে আহার করতে দিতে, তাদের ছায়া মাড়াতে, এমন কি দৃষ্টির সম্মুখে তাদের আসতে দিতে ইনকার করেছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তথাকথিত নীচ জাতিরা এই বীভৎস সমাজ ব্যবস্থায় তথাকথিত উচ্চ জাতিদের কাছে পশুর তুল্য ব্যবহারও পায়নি। এই বিপুল ঐতিহাসিক ভণ্ডামি এদেশের সংস্কৃতিতে, মনেপ্রাণে, অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে জ্বলন্ত মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমাজ ও সংস্কৃতির সর্বস্তরে এই সামগ্রিক ভণ্ডামির অজস্র নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। অন্যদিকে তথাকথিত নীচ জাতিগুলিও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে, এবং পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থেকে মূলত বিচ্ছিন্ন হয়ে, গণসংস্কৃতির অভ্যুত্থানের পথ প্রায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ করেছে। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে গণসংস্কৃতির রূপ না নিয়ে এলিট কালচারে পর্যবসিত হয়েছে। ভারতনাট্যম্, ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইত্যাদি এই এলিট কালচারেরই নিদর্শন। আদিবাসী কিংবা কৃষক-মজুর সমাজের বলিষ্ঠ লোকসংস্কৃতি সমাজের নীচের তলা থেকে আজও উপরে উঠে আসতে পারেনি। এদেশের যুবশক্তির বিনোদনের এবং সাংস্কৃতিক সংহতির অভাব বহুলাংশে এই গণসংস্কৃতির অভাবেরই ফলশ্রুতি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, জন্মগত জাতিভেদ বিলুপ্ত না হলে এদেশের জৈবিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সুদূর পরাহত। এ সত্যও স্পষ্টই প্রতীয়মান যে জাতিভেদ প্রথা এবং তার বিলুপ্তির সূত্র শুধু আর্থিক বিন্যাসের মধ্যে সন্ধান করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর রক্তের পবিত্রতায় বিশ্বাস, জাতিকেন্দ্রিক সংকীর্ণ রাজনৈতিক চেতনা, আর্থিক ক্ষেত্রে জাতি সংঘাত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতি সমন্বয়ের অভাব—কোনটিই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ প্রসূত নয়। যে সমাজ জন্মগত ভাবে মানুষের উচ্চনীচ ভেদাভেদ মেনে নিয়েছে, সেখানে বিজাতীয় পদ্ধতিতে একমাত্র অর্থনীতির মূলমন্ত্রে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রয়াস অলস কল্পনা মাত্র। জাতিভেদ শ্রেণীভেদেরই জটিল ভারতীয় প্রকাশ, কিন্তু এর উৎপত্তি ও সমাধানের সূত্র কেবলমাত্র আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে কিংবা অর্থনৈতিক উপাদানে গঠিত শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদেশের শ্রেণী সংগ্রাম তাই পাশ্চাত্ত্য জগতের শ্রেণী সংগ্রামের চেয়ে বহুগুণে জটিলতর, ব্যাপকতর ও কঠিনতর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ সত্য যাদের কাছে স্পষ্ট নয়, তাদের সংগ্রামী মনোবৃত্তি ও আদর্শ প্রশংসনীয় হলেও তারা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে চেনেন না বললে অত্যুক্তি হয় না।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন কাল থেকেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছে। বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম বহুল্যাংশে হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার প্রতিবাদ হিসেবে জন্মলাভ করেছিল। তান্ত্রিক মতবাদ ও আচারের প্রসারও জাতিভেদের বাধানিষেধ অস্বীকার করেই ঘটেছিল। মধ্য যুগের ভক্তি আন্দোলন একাধারে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন এবং হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী ছিল। কিন্তু প্রধানত দুটি কারণে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় এসব ধর্মীয় আন্দোলন জনসাধারণের অধিকাংশের সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। ভৌগোলিক এবং সামাজিক উভয় দিক থেকেই এদের ব্যাপ্তি ছিল সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র ধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব ছিল না বলে এদিক থেকে এসব ধর্মীয় আন্দোলনের সফলতা ছিল স্বভাবতই আংশিক। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীনকালে ভারতে এবং বহির্বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে এদেশে জাতিভেদ প্রথা বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তন বিরোধী হিন্দু সমাজের প্রচণ্ড হিংস্র পাল্টা আক্রমণে এদেশে বৌদ্ধধর্ম পরাজিত হল, আর জাতিভেদের দুর্ভেদ্য অচলায়তনকে আশ্রয় করে হিন্দু সমাজ আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন মোটামুটি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিল। কিন্তু এসব আন্দোলনও ভৌগোলিক এবং সামাজিক দিক থেকে বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করেনি বলে এবং জাতিভেদের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উৎসগুলির সন্ধান ও উচ্ছেদে সচেষ্ট না হয়ে কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রচারের মাধ্যমেই জাতিভেদের বিলোপ সাধনে প্রয়াসী ছিল বলে, সফলতার পথে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। যে ব্যাপক গণজাগরণ ও ধর্মহীন উত্তাল গণআন্দোলনের মাধ্যমে জাতিভেদকে অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা ছিল আধুনিক কালের এসব ধর্মীয় আন্দোলনের পরিধির বাইরে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর তীব্র ও ব্যাপক আন্দোলন সর্বজনবিদিত। গান্ধীজী বর্তমান জাতিভেদ প্রথারও আপাত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতাকে তিনি অধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পাপ বলে ঘোষণা করেছেন। অপরপক্ষে জাতিভেদকে তিনি অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেও অধর্ম কিংবা পাপ আখ্যা দেননি। তিনি চেয়েছিলেন অস্পৃশ্যতাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে এবং শত সহস্র জাতিগোষ্ঠীকে বিলুপ্ত করে চারিটি প্রাচীন মৌল বর্ণ বা শ্রেণীতে রূপান্তরিত করতে। এই চারিটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যেও সমস্ত উচ্চনীচ ভেদাভেদ সম্পূর্ণ তুলে দেবার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু বংশানুক্রমিক বৃত্তি তুলে দিতে তিনি সম্মত হননি। তাঁর মনে অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে, সময় বাঁচাতে এবং কারিগরি বিদ্যা সহজলভ্য করতে বংশানুক্রমিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত চতুর্বর্ণ অত্যন্ত উপযোগী। বিবাহ সম্বন্ধে অবশ্য তিনি বিশেষ রক্ষণশীল ছিলেন না। তিরিশ দশক থেকে তিনি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের সমর্থক ছিলেন, এবং শেষ বয়সে তাঁর নিজ তত্ত্বাবধানে মিশ্র বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু জন্মগত চতুর্বর্ণকে মহাত্মা গান্ধী প্রকৃতির নিয়ম বলে ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন যে, একমাত্র প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরাই এই নিয়ম আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। যে নৈরাজ্যবাদী আদর্শ সমাজে

তিনি বিশ্বাস করতেন, তার সাংগঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, জন্মগত বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত চতুর্বর্ণই এরূপ আদর্শ সমাজের ভিত্তি হবে।

স্বজাতির বাইরে বিবাহের সমর্থন এবং অস্পৃশ্যদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী জাতিভেদ বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথাও সত্য যে গান্ধীজীর পথে ভারতের জটিল শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ সম্ভব ছিল না, এখনও নয়। প্রথমত, জাতিভেদ প্রথাকে সমূলে বিনষ্ট না করে অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। কারণ যতদিন জাতিভেদ বর্তমান থাকবে, ততদিন এদের অন্য কোন জাতি গ্রহণ করবে না। অস্পৃশ্য নাম পরিবর্তন করে হরিজন নাম রাখলেই এদের পক্ষে সমাজের নীচের তলা থেকে উপরে উঠে আসা সম্ভব হবে না, যদি না সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকেই সমান করে ঢেলে সাজানো হয়। জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করলে অস্পৃশ্যরা পঞ্চমই থেকে যাবে, তাদের নতুন নামকরণ যাই হোক না কেন। দ্বিতীয়ত, শত সহস্র জাতিকে কিভাবে চার প্রধান শ্রেণীতে পর্যবসিত করা হবে, সে সম্বন্ধে গান্ধীজী কোন সুস্পষ্ট কার্যক্রম রচনা করতে পারেননি। বিভিন্ন কারণে বাস্তবে এমন রূপান্তর একেবারেই সম্ভব নয়, এবং গান্ধীজী এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সফলতা অর্জন করতে পারেননি। তৃতীয়ত, জন্মগত বৃত্তির ভিত্তিতে চার শ্রেণীকে বজায় রেখে তাদের মধ্যে পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা রক্ষণশীল মনের কল্পনাবিলাস মাত্র। পরিশেষে, চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন কার্যত মানুষের স্বাধীনতা, সৃজনীশক্তি ও সঞ্চরণশীলতাকে খর্ব করে প্রগতিবিরোধী, স্থাবর এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে চিরায়ত করবারই নামান্তর। ভারতে প্রকৃত সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে শাখা-প্রশাখা সমেত জাতিভেদের বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবার কোন অবকাশ নেই। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের অবিসংবাদী নেতা চিন্তানায়ক ডঃ বি আর আম্বেদকার অকাট্য যুক্তিতে এ সত্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন।

পরবর্তীকালে গান্ধীবাদী নেতারাও জাতিভেদ বিরোধী কোন আন্দোলন এদেশে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি। অন্যান্য অনেকের মত তাঁরাও একমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসমস্যার সমাধান সন্ধান করেছেন এবং কায়েমী স্বার্থের প্রতি নৈতিক আবেদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ব্রতী হয়েছেন। স্বাধীন ভারতে গান্ধীবাদী নেতারা শোষক শ্রেণী কিংবা অন্য কোন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রদর্শিত পথে প্রত্যক্ষ অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে শ্রেণী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন মাত্র। তাঁরা এ সত্য বুঝেও বোঝেননি যে, সহস্রধা বিভক্ত জটিল শ্রেণীভেদ বর্তমান থাকতে ভূদান বা গ্রামদানের সমবায়ী কার্যসূচী সফল হওয়া অসম্ভব। জাতিভেদের কঠিন সমস্যার সামনে এসে হয়ত বা জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে তাঁরা আধ্যাত্মিকতার সহজ পন্থাকে আশ্রয় করেছেন। নচেৎ ধীশক্তিসম্পন্ন সর্বোদয় নেতারাও কিভাবে জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে না তুলে ভারতের গ্রামীণ সমস্যার সমাধান করতে চান তা বোঝা দুঃসাধ্য।

রাজনৈতিক দলগুলিও জাতিভেদ বিরোধী কোন ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের রাজনৈতিক আদর্শ যাই হোক না কেন, প্রায় সব রাজনৈতিক দলই দেশের অধিকাংশ স্থানে নির্বাচনের সময় স্থানীয় অধিবাসীদের জাতিপ্রাধান্য লক্ষ্য করে সে অনুযায়ী প্রার্থী মনোনীত করে এবং নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রার্থীর জাতির ভিত্তিতেই নির্বাচকদের কাছে ভোটের জন্য

আবেদন জানায়। কোন বিপ্লবী দলই জাতিভেদের বিরুদ্ধে কোন সুসংবদ্ধ প্রচার কিংবা গণ-আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেনি। এ অবস্থার একটি কারণ এই যে, অনেক রাজনৈতিক দলই এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতিভেদ চেতনা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আরেকটি প্রধান কারণ এই যে, জাতিভেদ চেতনা এদেশের আমজনতার মনে এতই প্রবল যে, এ প্রথার সক্রিয় বিরোধিতা করতে গেলে যে কোন রাজনৈতিক দলই অনিবার্যভাবে তার জনপ্রিয়তা অন্তত সাময়িকভাবে হারাবে, এবং ফলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্য দল থেকে পিছিয়ে পড়বে। দেশের ও সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা চিন্তা করে কোন দলই আজ পর্যন্ত সাময়িক দলীয় ক্ষতি স্বীকার করে অপ্রিয় সত্যের ভিত্তিতে জনগণের জাতিভেদ চেতনায় আঘাত হানতে সাহসী হয়নি।

॥ ৪ ॥

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আর্থিক উন্নয়ন ও শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ চেতনা জনমানস থেকে স্বতঃই বিলুপ্ত হবে এবং ফলে জাতিভেদ প্রথার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে, তাঁদের মৌলিক ভ্রান্তির অজস্র প্রমাণ চোখের সামনেই রয়েছে। দেশের সব সংবাদপত্র জুড়ে যাঁরা পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেন, তাঁদের অধিকাংশ শিক্ষিত এবং অনেকে বিত্তবান। কিন্তু তাঁদের শিক্ষা ও বিত্ত জাতিভেদের অন্ধ কুসংস্কারকে টলাতে পারেনি। অনেক উচ্চশিক্ষিত এবং বিত্তবান ব্যক্তিই স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহে তো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বটেই, এমন কি অপরের সঙ্গে আহার করতে এবং অপরকে স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন। রক্তের পবিত্রতা ও জন্মগত উচ্চনীচ ভেদাভেদে বিশ্বাস এবং অন্যান্য গভীর কুসংস্কারের সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যা কিংবা সঞ্চিত অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক নেই। এদেশের ঘরে ঘরে তার প্রমাণ মিলবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কৃষক কিংবা শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমেও জাতিভেদ বিলুপ্ত করার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ যাঁরা এ ধরনের কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁরাই জানেন যে বিশেষ আর্থিক দাবিদাওয়া ছাড়া কোন বিষয়েই বিভিন্ন জাতির শ্রমিক কিংবা কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে তো নয়ই। অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করলেও এভাবে এদেশের কৃষক-মজুরের মানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছে বা সামাজিক চেতনার বিশেষ উন্মেষ হয়েছে, এমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই। অতএব ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসব আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রাম আখ্যা দেয়া যায় না, কারণ জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এদেশের জটিল শ্রেণীবৈষম্যকে এ ধরনের আন্দোলন টলাতে পারে না। আর এ জাতীয় আন্দোলনের এহেন পরিণতিই স্বাভাবিক, কারণ আগেই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে যে এদেশে জাতিভেদের মূল অর্থনৈতিক কাঠামোকে অতিক্রম করে বহুমুখী হয়ে সমাজের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। পুঁজিপতি, জোতদার, মহাজন প্রভৃতি জালিমদের বিনাশ করা এবং সেজন্য ক্রান্তিকারী কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা সচেতন মানুষের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কিন্তু কেবলমাত্র এর মাধ্যমে সহস্রধা বিভক্ত ভারতীয় শ্রেণীসমাজকে সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো সম্ভব নয়। কায়েমী আর্থিক স্বার্থকে শায়েস্তা করে মেহনতী মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য যাঁরা বিরামহীন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাঁরা সকলের শ্রদ্ধাভাজন। সর্বদেশে সর্বকালে এ ধরনের আন্দোলনের প্রয়োজন ও ঐতিহাসিক ভূমিকা যে কোন

শরিফ এবং অনুভবী মানুষই একবাক্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু এহেন আন্দোলনকে অন্তত এদেশের পটভূমিতে প্রকৃত শ্রেণী সংগ্রাম আখ্যা দেয়া কোন মননশীল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেককে আবার বলতে শোনা যায় যে, একমাত্র কোন মহামানবের আবির্ভাবেই জাতিভেদের জহর থেকে এদেশের সমাজ জীবন মুক্ত হতে পারে। কিন্তু যে বিষ যুগ যুগ ধরে বাসা বেঁধেছে লক্ষ কোটি মানুষের অবচেতন মনের গহনে, কোন নীলকণ্ঠই সে বিষ পান করে এ সমাজকে অমৃতলোকে জাগ্রত করতে পারবেন না। আত্মবিস্মৃত যে বিপুল জনতা দিবসে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, কোন মুয়েজ্জিনের উদাত্ত কণ্ঠস্বরই তাদের সহসা সচেতন করে তুলতে পারবে না। শ্যামের বাঁশীতে হয়তো বা যমুনার জলে উজান বইতে পারে। কিন্তু অযুত নিযুত মানুষের মনে জোয়ার আসবে না। এমনিতর অনেক মহামানব এদেশের সামাজিক কাঠামোকে বিন্দুমাত্র নড়াতে না পেরেই অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছেন। এদেশের ভীষণ কঠিন শ্রেণী সংগ্রাম ধূসর প্রসর রাজপথে, গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, মানুষের ঘরে ঘরে, বিরাট এবং বহুমুখী জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়েই আত্মপ্রকাশ করবে।

পৃথিবীর সব দেশে যে বিপ্লবী যুবশক্তি ইতিহাসের অগ্রদূত সে যুবশক্তিই ভ্রান্ত চেতনায় আচ্ছন্ন এদেশের বিপুল জনতাকে তারুণ্যের কষাঘাতে তীব্র ভীষণ চেতনায় জাগিয়ে তুলতে পারে। মানবতার আদর্শের আলোকে উজ্জ্বল যুবশক্তিই ভারতীয় সমাজের সারিসারি লৌহপ্রাকারগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে মানুষের মনের আর ঘরের দরজা একই সঙ্গে খুলে দিতে পারে। লক্ষ লক্ষ এই বিদ্রোহী নায়কনায়িকারাই স্পর্ধা রাখে বেশরম জাতিভেদে পদাঘাত হেনে শুধু মানবতার পরিচয়ে আর ভালোবাসার অঙ্গীকারে জীবনসাথী বেছে নিতে, আর এই মানবতা ও মুক্ত ভালোবাসাকে এক বিরাট গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে। তারাই জানে সমাজের পিরামিডকে উল্টে দিয়ে নীচের তলার অস্পৃশ্য, আদিবাসী আর শূদ্রদের সকলের উপরে এনে বসাতে। বহু যুগ সঞ্চিত ধর্মীয় কুসংস্কারকে যৌবনের অনলে দগ্ধ করে তারাই পারে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান আর পারস্পরিক সম্বন্ধকে মানবতার সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে। নির্ভয় যৌবনই পারে এদেশের এলিট কালচারকে ছাপিয়ে দিয়ে অস্পৃশ্য, আদিবাসী আর শূদ্রদের বলিষ্ঠ সংস্কৃতিকে গণসংস্কৃতির রূপ দিতে। তারাই সাহস রাখে জাতিগোষ্ঠীর নামে মানবশিশুর নাম না রেখে তাকে নতুন নামে ডাকতে, তার ছাড়পত্রে শুধু মানুষের পরিচয়টুকুই লিখে দিতে। যেদিন এ বিরাট বিপ্লব সমাজকে তোলপাড় করবে, সেদিন জাগ্রত শোষিত মানুষ সমস্ত সামাজিক শোষণের সঙ্গে আর্থিক শোষণের শৃংখলও চকিতে চূর্ণ করবে। সুচেতন মানব সন্তান সেদিন রুদ্রমূর্তিতে সব অসুরকেই সংহার করবে। এত বড় ভীষণ বিপুল সাংস্কৃতিক বিপ্লব পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে কোনকালে হয়নি, কারণ ক্রান্তির পথে এত কঠিন আর এত অসংখ্য বাধাবন্ধ পৃথিবীর আর কোন দেশে ছিল না, আজও নেই। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে কোন মহামানব কিংবা মহাবিপ্লবী আজ পর্যন্ত এত বড় বে-নজির গণবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন নি। ভারতের ঘরে ঘরে এ বিরাট সাংস্কৃতিক বিপ্লব একদিনে সম্ভব নয়। কিন্তু আজ যদি ভারতের দুরন্ত যৌবন হাওয়ার মুখে ঝড়ের বীজ ছড়িয়ে দিতে পারে, তবে আগামীকাল নিঃসন্দেহে সে তুফান ভারতের মুক্তি আনবে।

সাম্প্রদায়িকতার উৎস

যেসব দুর্মর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মনুষ্যসমাজে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করে মানব জাতির সংহতি ও প্রগতিকে প্রতিহত করছে, সাম্প্রদায়িকতা তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। ভদ্রবেশী এই বর্বরতা আধুনিক যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মান্ধতা ও বিকারগ্রস্ত রাজনীতির যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বলি দিয়েছে, আর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে করেছে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। চিরপুরাতন জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় হিন্দু সমাজকে সহস্রধা বিভক্ত করে এদেশের তথা মনুষ্যজাতির কলঙ্করূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর দেশকে করেছে শক্তি ও প্রগতিহীন। তার উপর আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এদেশের সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে, খর্ব করেছে তার শক্তি, মন্থর করেছে তার গতি-বেগ, আর পৃথিবীর সামনে রচনা করেছে এদেশের জন্য এক হীনস্থান। ক্রান্তিকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কলুষ থেকেও এদেশকে মুক্ত করতে না পারলে বিরাট প্রাণের স্পন্দন আর গণশক্তির অভ্যুদয় আমাদের মুমূর্ষু জীবনে আর আসবে না কোনদিন।

সমাজবিজ্ঞানে সম্প্রদায় কিংবা কমিউনিটি বলতে ধর্মভিত্তিক সামাজিক বিভাজন বোঝায় না। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মাঝে গড়ে ওঠা এবং পারস্পরিক একাত্মবোধ, ভূমিকাবোধ ও নির্ভরশীলতাবোধ প্রভৃতি অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন মানব-গোষ্ঠীকেই সম্প্রদায় আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু বিচিত্র এই ভারতবর্ষে শ্রেণীভেদ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যেমন আজব রূপান্তর ঘটেছে, হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় এবং সাম্প্রদায়িকতাও তেমনি এক বিকৃত ও বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। এদেশে হিন্দু-মুসলমানের জটিল ঐতিহাসিক সম্পর্কের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেই অতএব সাম্প্রদায়িকতার উৎস ও তার সমাধান সন্ধান করতে হবে।

হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের তত্ত্বগত আসমান-জমিন পার্থক্য এবং তজ্জনিত তাদের পারস্পরিক অসামঞ্জস্য ও বিরোধিতাকে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ বলে গণ্য করাই প্রচলিত রীতি। আর এই ধারণার বশবর্তী হয়েই এদেশের অনেক চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারক সর্ব ধর্মের সমতা কিংবা সমন্বয়ের বাণী প্রচার করে এদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এবং বাস্তব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন একমাত্র মহাত্মা গান্ধী, এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁর আজীবন সাধনাই জাতীয় সংহতি নির্মাণে এ-যুগের বৃহত্তম ও মহত্তম প্রয়াস। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে, শৈশব থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির স্বপ্ন দেখতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত ভারতীয়দের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সময়ও তিনি ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের

প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখবার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালে অহিংস অসহযোগের মাধ্যমে সারা ভারতে সর্বপ্রথম যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন তিনি গড়ে তোলেন, তারও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসকে শামিল করে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সুদৃঢ় করা। পরবর্তী কালে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং খুনোখুনির বিরুদ্ধে তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন এবং পরস্পরের ধর্মের প্রতি হিন্দু-মুসলমানদের শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার বাণী প্রচার করেছেন। ১৯৪৬ সনে আসন্ন স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে যখন একদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি এবং অন্যদিকে ধর্মের নামে ব্যাপক গণহত্যা চলছিল, গান্ধীজী তখন ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল দিল্লি থেকে বহু দূরে নোয়াখালি এবং বিহারে কঠিন প্রত্যয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে একক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জীবনের শেষ অনশন সত্যাগ্রহও ছিল রাজধানী দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে। অন্তিম আত্মবলিদানও তিনি করে গেছেন ধর্মের নামে মানুষে মানুষে অন্ধ হিংসার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ হিসেবে।

শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, প্রচলিত ধর্মীয় আচারের মাপকাঠিতে বিচার করলে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মতামত ছিল এক অর্থে যুগোত্তীর্ণ। প্রথম জীবনে বিবাহ বিষয়ে যদিও তিনি সাধারণ-ভাবে সনাতনপন্থী ছিলেন, তিরিশ দশকের মধ্যভাগ থেকে তিনি এই মনোভাব পরিবর্তন করে হিন্দু-মুসলমানের অবাধ বিবাহ সমর্থন করেন এবং স্বাগত জানান। তবে তাঁর বক্তব্য ছিল যে কোন পক্ষই নিজের ধর্ম পরিবর্তন করবে না এবং নিজ নিজ ধর্মে গভীর আস্থা পোষণ করবে। পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাই হবে এ ধরনের বিবাহের ভিত্তিস্বরূপ। দুই ধর্মের মধ্যে যে কোন ধর্মের পুরোহিতই এরকম বিবাহের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন। আর প্রয়োজনবোধে সিভিল বিবাহও চলতে পারে। বর্তমান কালে এ-আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হলে এবং নিজের জীবনে রূপায়িত করতে হলে অনেক উচ্চণ্ড প্রগতিশীলই সম্ভবত মূর্ছা যাবেন।

গান্ধীজীর এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ কিন্তু সম্পূর্ণই ভর করে ছিল প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস আর পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উপর। নিজের জীবনে তিনি ছিলেন গভীর ধার্মিক, আর হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অটল আনুগত্য তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন। তিনি আশা করতেন যে, মুসলমানও তাঁর নিজের ধর্মে গভীর আস্থা পোষণ করবেন এবং সে ধর্মের মধ্যে নিজের জীবনকে উচ্চগ্রামে বেঁধে রাখতে প্রয়াসী হবেন। স্বধর্মের প্রতি এই অচল আস্থা ও আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষ অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে এবং পরধর্মকে ভয়াবহ জ্ঞান না করে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। নয়নের দৃষ্টি থেকে বিদ্বেষের কালো ঘুচলে পরে মানুষ যে ধর্মের দিকে চোখ মেলবে সেখানেই আলো দেখতে পাবে। নিজের ধর্মে যিনি প্রকৃত ধার্মিক, পরধর্মেও তিনি ঈশ্বর-আল্লার প্রকাশ দেখতে পাবেন। এই আশায় বুক বেঁধেই তিনি চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন, এবং এ বিশ্বাসেই জীবনের প্রতি সন্ধ্যায় মিশ্র প্রার্থনা-সভায় গীতা, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে সমবেত শ্রোতাদের পাঠ করে শোনাতেন।

বর্তমান ভারতেও অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝেন নিজের ধর্মাচারে অবিচল থেকে পরধর্মের প্রতি অহিংস মনোভাব পোষণ করা। এ ধারণা বহুল প্রচলিত যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমানভাবে বিকাশ লাভ করবার সুযোগ দেবে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোককে জাগতিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ অধিকার দেবে।

তারপর সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ পর্যন্ত সকলেই যে যার জপতপ, নামাজ-প্রার্থনা, পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাধুসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এই মতে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, এর ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি এবং অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে উঠে জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করে তুলবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতাকে শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় বোঝাপড়ার ব্যাপার মনে করা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুতর ভুল, এবং এক গভীর ও বহুমুখী সামাজিক সমস্যার অতিসরল ব্যাখ্যা ও সমাধানের প্রয়াস মাত্র। আর এ জটিল সমস্যার প্রতি এদেশের চিন্তানায়ক এবং সমাজ-সংস্কারকদের এই অতিসরল মনোভাবই আধুনিক যুগেও ভারতবর্ষে এক বিরাট সামাজিক কলঙ্কের স্থায়িত্বের কারণ। ১৯৪৬ সনে মহাত্মা গান্ধী আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, আজীবন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার পর যদি তিনি ভাবতে পারতেন যে, এ সমস্যার সমাধান হয়েছে, তবে এই জীবন-সন্ধ্যায় তিনি আনন্দে শিশুর মত নৃত্য করতেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। জীবনের শেষ অঙ্কে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রায় একক ব্যর্থ সংগ্রাম এবং তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনাকে ছিন্নভিন্ন করে ভারতীয় উপ-মহাদেশের দ্বিধাবিভাগ, তাঁর নৈতিক উদারতা ও প্রগতিশীলতার পেছনে পথের বিভ্রান্তিরই দুঃখবহ পরিচয়। আর নব্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও নীতির আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার দুর্মর কালসাপ ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলে উঠবার কারণও চিন্তার ও পন্থার বিভ্রান্তি। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আবরণের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বহু গভীরতর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ এদেশের ইতিহাসের গহনে নিহিত আছে, এবং সে সব কারণ দূর না হলে কেবলমাত্র ধর্মভীরু মানুষের চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সামাজিক পরিবেশ থেকেই মানুষের ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা ও চিন্তাধারা গড়ে ওঠে, আর মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত সংঘাতের বীজও সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই নিহিত। সে পরিবেশের সংস্কার, শোধন ও পরিবর্তন না করে শুধু মিষ্টি কথা বা ধর্মচিন্তার মাধ্যমে এ সংঘাতের মূলোচ্ছেদ করা অথবা কোন নকল মানবগোষ্ঠীর হৃদয়ের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

॥ ২ ॥

এদেশে সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক। মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে শোষিত ও নিপীড়িত যেসব তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ সমাজের একেবারে নীচের তলায় পড়েছিল, প্রধানত তাদের মধ্য থেকে ধর্মান্তরিত হয়েই বহুসংখ্যক মানুষ এদেশে মুসলমান হয়েছিলেন। বহিরাগত মুসলমানেরা সংখ্যায় ছিলেন নগণ্য, এবং তাঁরা সর্বদাই এ দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের একেবারে উপর তলায় থেকে সব রকম রাজনৈতিক ও আর্থিক সুবিধা ভোগ করতেন। তাঁদের সঙ্গে এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না, আর তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আর্থিক বৈষম্য ছিল আসমান-জমিন। উপরন্তু, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ হিন্দুর মত অধিকাংশ মুসলমানও ক্ষুদ্র চাষী কিংবা দিনমজুর হিসেবেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। শুধু ধর্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের শেকল ছিঁড়ে আর্থিক প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইংরেজ আমলে হিন্দু-মুসলমানের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক পরিবর্তন ঘটে। যে আগ্রাসী বিদেশী শক্তি তাঁদের হাত থেকে রাজশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিল, তার সংগে এদেশের পরাজিত মুসলমান রাজন্য ও সামন্তরা কোন আপোস করেননি। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজের অধীনে চাকুরির জন্য তাই তাঁরা বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। অনেকটা সে কারণেই ব্রিটিশ সরকার এদেশের মুসলমানদের কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখতেন। অপর পক্ষে মুসলিম শাসনে নিপীড়িত হিন্দু সমাজ মুসলমান শাসকদের শত্রু ইংরেজের অধীনে শিক্ষা লাভ এবং চাকুরি গ্রহণ করে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির সুযোগ পেল। ফলে ইংরেজ আমলের প্রথম যুগ থেকেই ইংরেজী ভাষায় সামান্য শিক্ষিত এবং ইংরেজের অধীনে করণিক কিংবা মুনশির কাজে নিযুক্ত এক তথাকথিত ভদ্রলোক কিংবা বাবু শ্রেণী হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও হিন্দুরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন, এবং কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে অধিকাংশ জমিদারীও হিন্দুদের হাতে চলে যায়। এমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরে লভ্য বেশির ভাগ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা হিন্দুরা অধিকার করে নেন এবং ফলে মুসলমানদের আর্থিক পরিস্থিতির তুলনামূলক অবনতি ঘটে, আর অধিকাংশ মুসলমান সত্যিকারের প্রোলিতারিয়েতে পরিণত হন। অতল দারিদ্র্যে নিমজ্জিত এবং বিদেশী শোষণ-শাসনে জর্জরিত এদেশের সব সাধারণ মানুষই অবশ্য এক অর্থে প্রোলিতারিয়েত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তথাপি ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে হিন্দুদের সামনে এল ক্রমবর্ধমান সুযোগ-সুবিধা, আর মুসলমানদের সামনে নেমে এল হতাশা আর অন্ধকার।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় থেকে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের মুসলমানবিরোধী নীতি বিশেষ প্রকট রূপ ধারণ করে, কারণ ইংরেজের দৃষ্টিতে এ বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিলীয়মান মুসলমান রাজকীয় শ্রেণীর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ। এ সময়ে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু আধিপত্যে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ সময়েই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরি, স্বাধীন পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সবচেয়ে বেশী এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশ অনিবার্যভাবে এক শোষিত আর্থিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এভাবে ধর্মের সঙ্গে আর্থিক অবস্থার এক সমীকরণ সৃষ্টি হয়, এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ধর্মের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবিদ্বেষের রূপ নেয়। ১৯০৫ সনের পর থেকে ইংরেজ সরকারের নীতি অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে, এবং সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যুগিয়ে রাজনৈতিক দিক থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংঘাতে অবতীর্ণ হবার জন্য এদেশের মুসলমানদের, বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের, উৎসাহিত করে। কিন্তু এর ফলে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মুসলমানের আর্থিক অবস্থার কোন তুলনামূলক উন্নতি হয়নি, কারণ শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে তারা ইতিমধ্যেই অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। এই আর্থিক স্বার্থের সংঘাতেই প্রধানত হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সংঘাত ও পাকিস্তানের দাবিকে ক্রমশ শক্তিশালী করে তোলে।

কিন্তু আর্থিক সংঘাত সাম্প্রদায়িকতার প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উৎস নিহিত আছে। ব্রাহ্ম সমাজ থেকে আরম্ভ করে প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি যেসব ধর্মসংস্কারমূলক

আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাদের উৎস ও অনুপ্রেরণা মূলত হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে জাতীয় রাজনৈতিক নবজাগরণ বহুলাংশে এই ধর্মীয় নবজাগরণেরই ফলশ্রুতি। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতির সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাও ছিল ধর্মীয় প্রেরণা প্রসূত, এবং ১৯০৫ সালের স্বদেশী কিংবা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এ ধরনের হিন্দুধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিশেষ বিকাশ ঘটে। পরবর্তী কালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনও প্রকাশ্য এবং স্বীকৃত রূপেই গড়ে উঠেছিল ধর্মচিন্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে, কারণ গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা ধর্ম ও রাজনীতিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত জ্ঞান করতেন। তাত্ত্বিক দিক থেকে গান্ধীজীর মতে এহেন ধর্মীয় রাজনীতি কোন ধর্মবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন মূলত হিন্দু-ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

হিন্দু সমাজের মধ্যে এ ধরনের ধর্মীয় নবজাগরণ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া এদেশের মুসলমানদের পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক। যে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন থেকে ভারতে তীব্র এবং ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত, সে আন্দোলন শুধু যে প্রেরণা ও ব্যবহারিক দিক থেকে হিন্দু ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই নয়, সেটি গড়ে উঠেছিল ভারতের এমন একটি প্রদেশে যেখানে ধর্মের দিক থেকে মুসলমানেরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বাংলার মুসলমানেরা যদি শামিল না হয়ে থাকেন তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এও কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়েই মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জন্মলাভ করে এবং মুসলিম লীগের শিলান্যাস হয়। একই কারণে পরবর্তী কালে গান্ধীজী পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন থেকে ভারতের অধিকাংশ মুসলমান দূরে সরে থাকেন, এবং ইংরেজের প্ররোচনায় ও জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ক্রমশ শক্তিশালী হয়।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত দুটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে, যার ফলে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে উভয় ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে এক দুস্তর সামাজিক বাধা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু সমাজব্যবস্থার মধ্যে এক দিকে যেমন আছে কিছুটা উদার পরমতসহিষ্ণুতা, অপর দিকে তেমনি আছে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের একান্ত অভাব। অগণিত ধর্মীয় মতবাদ, এমন কি নাস্তিক মতবাদের সহাবস্থান সহনশীলতার পরিচায়ক, আবার অন্য দিকে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সামাজিক গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ অভাবের জ্বলন্ত উদাহরণ। অপর পক্ষে ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রায় পূর্ণরূপে বিকশিত। কিন্তু বিধর্মীর প্রতি অসহিষ্ণুতা অত্যন্ত প্রকট। ইসলামে বিশ্বাসীদের মধ্যে সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্ভবত অন্য যে কোন ধর্মগোষ্ঠীর চেয়ে প্রবলতর। আবার তেমনি অপর ধর্মগোষ্ঠীর প্রতি, বিশেষত মরুভূমিজাত ধর্ম ছাড়া অপর সব ধর্মের প্রতি, অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষ সম্ভবত অন্য কোন ধর্মগোষ্ঠীর পরধর্ম বিদ্বেষের চেয়ে প্রকটতর। তাত্ত্বিক দিক থেকে এদেশের হিন্দুরা যদি মুসলমানদের কাছে গণতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করতেন, আর মুসলমানেরা যদি হিন্দুদের কাছে পরমত-সহিষ্ণুতা শিখতেন, তবে এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের পরিবর্তে এক সমন্বয়ধর্মী উদার সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু বহু শতাব্দীর পুঞ্জিত ভ্রান্ত চেতনাকে অস্বীকার করে, এবং আধুনিক যুগের আর্থিক ও রাজনৈতিক সংঘাতকে উত্তরণ করে এই আদর্শ তাত্ত্বিক পরিস্থিতি গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়ত, অসংখ্য সামাজিক শ্রেণীভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ মুসলমানদের সমাজের একেবারে নীচের তলায় ঠেলে দিয়েছিল। হিন্দু সমাজের নিপীড়িত এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণী থেকে মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, ঐতিহাসিক দিক থেকে এই ছিল সম্ভবত মুসলমানদের সামাজিক হীনস্থানের প্রধান কারণ। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক দিক থেকে হিন্দু অস্পৃশ্যদের চেয়েও মুসলমানদের অবস্থা ছিল নিকৃষ্টতর। আর্থিক বৈষম্য এই সামাজিক বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। তাছাড়া খাদ্যাখাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, নামকরণ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক পার্থক্য ছিল অসংখ্য। সব কারণ মিলে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক বৈষম্য এদেশে এত প্রকট রূপ ধারণ করে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই ধর্মের লোকেরা একই গ্রাম কিংবা শহরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় বাস করতেন। সামাজিক বিচ্ছেদ ও ভৌগোলিক বিচ্ছেদ পরস্পরকে বাড়িয়ে তুলতো চক্রবৃদ্ধি হারে।

সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক উৎসও যে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে কম গভীর নয়, তা এই শতকের প্রথমার্ধের রাজনৈতিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক ও সামাজিক সংঘাতও অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে পরাজিত ভারতীয় সমাজের এক আধিবিদ্যক জবাব স্বরূপ, এবং তারই মধ্য দিয়ে পরাজিত হিন্দু সমাজ পরোক্ষভাবে নিজের হৃতগৌরব ফিরে পাবার প্রয়াস পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষা এবং ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনগুলিও ছিল ইংরেজ রাজত্বের কাঠামোর মধ্যে হিন্দু সমাজের হারানো গৌরব ফিরে পাবার পরোক্ষ প্রয়াস। এসবের মাধ্যমে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর্থিক সুযোগ-সুবিধাগুলি অধিকার করে ফেলে, আর অন্যদিকে মুসলমান সমাজ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণকারী আগ্রাসী বিদেশী শক্তির কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। কিন্তু এই শতকের প্রথম থেকে, বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে, স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে, মারমুখী জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার ভারতে কিছু কিছু রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করবেন, যার ফলে এদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। যে মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দু আধিপত্যে গড়ে ওঠা রাজনীতি থেকে এতকাল দূরে সরে ছিলেন, তাঁরাই এই নতুন পরিস্থিতিতে হিন্দুদের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে ইংরেজ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি যথাসম্ভব অধিকার করে নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। ফলে ধর্মগোষ্ঠীভিত্তিক মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলন জন্মলাভ করল।

শাসিতদের বিভক্ত করে নিজেদের শাসন কায়েম রাখবার নীতিতে বিশ্বাসী ইংরেজ সরকার এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলিম রাজনীতিকে স্বাগত জানালেন, এবং সর্বতোভাবে তার শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করলেন। ১৯০৯ সালের মর্লে মিণ্টো রিফরমের সময় থেকে মুসলমানদের আলাদা ভোটের ব্যবস্থা করে, এবং সংখ্যানুপাতের চেয়ে অনেক বেশী হারে তাদের আসনসংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়ে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে নিজ স্বার্থে আরও তীব্র করে তুললেন। ১৯১৯-এর মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফরম ও ১৯৩৫-এর গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাকটে এই ব্যবস্থাকে আরও অনেক ব্যাপক এবং প্রকট রূপ দান করে তাঁরা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক বিভেদকে চিরস্থায়ী করবার অসাধু প্রয়াসকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন আর কায়েমের পথ প্রশস্ত করলেন। কিন্তু এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে

শুধু ধর্মীয় সমস্যা মনে করাও যেমন ভুল, তেমনি সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সরকারের সৃষ্টি মনে করাও আরেক গুরুতর ভুল। এই দুই ভুল মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে অনেক ভারতীয় নেতাই করেছেন। ইংরেজ সরকার তাঁদের সাম্রাজ্যকে যথাসম্ভব দীর্ঘ-স্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে এ দেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন যুগিয়েছেন সত্যি, কিন্তু আর্থিক, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে এ সমস্যাকে মূলত তাঁরা সৃষ্টি করেননি।

॥ ৩ ॥

দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রূপেরও পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু মূল আর্থিক ও সামাজিক কারণগুলি দূর হয়নি। ভারতে আজও আর্থিক দিক দিয়ে মুসলমানেরা অত্যন্ত অনগ্রসর। সারা দেশই যেখানে দারিদ্র্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত, সেখানে দরিদ্র মানুষের অবস্থার তারতম্য বিচার করা অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ। কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ধর্মগোষ্ঠীর ভিত্তিতে তুলনা করলে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা দরিদ্রতর। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁরা তুলনাক্রমে অনগ্রসর, এবং হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে অশিক্ষিতের হার বেশী। এই দারিদ্র্য ও অশিক্ষাবশত স্বভাবতই মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে আর্থিক প্রতিযোগিতায় হীনবল। তার উপর আবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চাকুরি এবং পেশার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাধারণভাবে বঞ্চিত রেখেছে। একটি শিক্ষিত হিন্দু যুবকের চেয়ে একটি শিক্ষিত মুসলমান যুবকের পক্ষে চাকুরিতে কিংবা কোন স্বাধীন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া হাজার গুণ কঠিন। স্বাধীন ভারতে বহু সংখ্যক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি প্রধান কারণও অর্থনৈতিক। ইংরেজ আমলে সরকারী প্ররোচনায় এবং স্বার্থান্বেষী নেতাদের পরিচালনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনেক সময়ই মুসলমানেরা প্রাথমিক আগ্রাসীর ভূমিকা নিতেন। স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আগ্রাসীর ভূমিকা প্রধানত হিন্দুরাই নিয়েছেন, এবং এর একটি প্রধান কারণ দাঙ্গার মাধ্যমে স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে মুসলমানদের বিষয়-সম্পত্তি লাভ এবং জীবিকার ক্ষেত্রে তাঁদের স্থানীয় প্রতিযোগিতার অবসান।

স্বাধীন ভারতে হিন্দু সমাজ এবং মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে, কিংবা দেশ-ব্যাপী জাতিধর্মনির্বিশেষে, কোন ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত না হওয়ার ফলে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কুসংস্কার এবং উভয় ধর্মগোষ্ঠীর সামাজিক বিচ্ছেদ এক অচলায়তনের রূপ নিয়েছে, আর এদেশে মানবতাধর্মী সমসমাজ গঠনের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই রয়ে গেছে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কঠোর সামাজিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছেদ আজও কাঁচের দেওয়ালের মত এ দেশের মাঝখানে নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে দেখা যায় কিন্তু চেনা যায় না। সামাজিক সংযোগ কিংবা যৌথ ক্রিয়াকলাপ তো দূরের কথা, মিশ্র বিবাহ তো পাগলের প্রলাপ, এ দুর্ভাগা দেশে হিন্দুর কাছে মুসলমান শব্দটিই অবজ্ঞা ও হীনস্থান ব্যঞ্জক।

বর্তমান ভারতে সাম্প্রদায়িকতার আর্থিক ও সামাজিক কারণগুলিকে একদিক থেকে আরও শক্তিশালী করেছে দেশ বিভাগের পর নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং তার পরিণতিতে দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান থেকে অযুত-নিযুত বাস্তুহারার ভারতে

আগমনের জন্য এদেশের অধিকাংশ হিন্দু সচেতন কিংবা অচেতনভাবে ভারতীয় মুসলমানদেরই দায়ী করেছেন এবং আজও করেন। অনেক হিন্দু এদেশের সব মুসলমানকেই পাকিস্তানের চর বলে গণ্য করেন। এই রাজনৈতিক বিদ্বেষ ইন্ধন যোগায় সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও সংঘাতে, আর সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাগুলিকে করে তোলে তীব্রতর। স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সাফল্যের তাগিদে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব কিংবা আর্থিক অনগ্রসরতা বিশেষ হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু বলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের সংখ্যালঘু আখ্যা দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের অমর্যাদা করা হয়েছে। ফলে এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানেরা এদেশে এক ধরনের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, যদিও ভারতীয় সংবিধান এবং রাষ্ট্রীয় নীতি প্রকৃতপক্ষে এরূপ ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ভারতবর্ষে কয়েক যুগ ধরেই মুসলমানদের যে অবস্থা চলছিল এবং আজও চলছে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর সে দেশে হিন্দুদেরও সে অবস্থায়, হয়তো বা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়েছে। ভারতে অন্তত সরকারী নীতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। কিন্তু শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারী নীতি প্রকাশ্যভাবেই হিন্দুবিরোধী রূপ ধারণ করেছিল। আর্থিক ক্ষেত্রে তাই পাকিস্তানী হিন্দুদের চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সামাজিক এবং ভৌগোলিক বিচ্ছেদের দিক থেকেও পাকিস্তানী হিন্দুদের অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় মুসলমানদের মতই। আর যে গভীর রাজনৈতিক বিদ্বেষ পাকিস্তানের জন্মদান করেছে, এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলে অন্ধ সংঘাতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে বিদ্বেষই পাকিস্তানের রাজনীতিতে হিন্দুদের জন্য হীনস্থান রচনা করেছে। ভারতে নির্বাচনী রাজনীতির প্রয়োজনে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার অনেকখানি সংরক্ষিত হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানের তানাশাহী শাসনব্যবস্থায় সে প্রয়োজন না থাকায় হিন্দুরা রাজনৈতিক দিক থেকে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ অধিকারহীন। বর্তমান পাকিস্তানে, অর্থাৎ পূর্বতন পশ্চিম পাকিস্তানে, আজ আর উল্লেখযোগ্য কোন সংখ্যালঘু ধর্মগোষ্ঠী নেই। আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রথম পর্যায়ে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের রাজনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফলে হিন্দুরা রাজনৈতিক অধিকার অনেকাংশে ফিরে পেয়েছিল, যদিও দুর্ভাগ্যবশত ভারতের মত সেখানেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরই রাজনীতি ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু বলা হতো। কিন্তু মুজিবোত্তর বাংলাদেশের সামরিক শাসকগোষ্ঠী আবার ধর্মের বুলি আওড়াতে শুরু করেছে, মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে।

॥ ৪ ॥

ইতিহাসে কোন দিন সমাজের পাপ আপনার প্রকাশ লজ্জায় আপনি মরে যায় নি। মানুষ যৌথ প্রয়াসে বার বার সমাজকে কলুষমুক্ত করেছে। সাম্প্রদায়িকতারূপী কঠিন পাপকে নির্মূল করতে হলেও বিরাট ও বহুমুখী সাংস্কৃতিক বিপ্লব অপরিহার্য। উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে, সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত উৎসগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাসের গভীরে নিহিত এবং এ সমস্যার বিভিন্ন আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক আছে। এ জটিল সমস্যা সমাধানের সূত্রও তাই অর্থনীতি, সমাজনীতি

গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে ধর্মনির্বিশেষে দরিদ্র মানুষের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টিই সাম্প্রদায়িকতার আর্থিক কারণের মৌলিক সমাধান। ব্যাপক বিজ্ঞানধর্মী গণশিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনকে কুসংস্কারমুক্ত করে তুলতে পারলে তার মানবতাবোধ স্বতই জাগ্রত হবে। রাষ্ট্রীয় নীতি ও যৌথ গণপ্রচেষ্টার মাধ্যমে উভয় ধর্মগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থায় আনতে হবে বৈপ্লবিক উদারনৈতিক পরিবর্তন, আর উত্তাল সাংস্কৃতিক গণবিপ্লবের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে নবকলেবরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সাম্য ও মানবতার যুগধর্মী বুনিয়াদে। পৃথক বিবাহ ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, খাদ্যা-খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার, নামকরণ প্রভৃতি এই বিপ্লবের দুর্নিবার খরস্রোতে অনিবার্য ভাবেই ভেসে যাবে ছিন্নপত্রের মত। এহেন আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী রূপেই প্রভাব বিস্তার করবে জাতীয় রাজনীতির উপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনস্বীকার্য প্রয়োজন দেখা দেবে রাজনীতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও যৌথ সামাজিক নীতি পরিবর্তনের। রাষ্ট্রীয় নীতি এবং দলীয় তথা সামগ্রিক রাজনীতি থেকে ধর্মকে চিরনির্বাসন দিয়ে শুধু মানবতার উপরই জাতীয় রাজনীতিকে অধিষ্ঠিত করতে হবে। আর রাজনীতিতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু স্থির হবে একমাত্র রাজ-নৈতিক শক্তির অনুপাতেই, ধর্মগোষ্ঠীর ভিত্তিতে নয়।

মৌলিক ধর্মবিশ্বাসের উপর কঠিন বৈপ্লবিক আঘাত না হানলে এ-ধরনের মানবতা-ভিত্তিক সমসমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, একমাত্র কঠোর ধর্মহীনতার উপরই মানবতার জয়স্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব। মৃত্যুভয়, পরলোক কামনা, জীবনের উৎকণ্ঠা, মাতাপিতারূপী রক্ষকের মানসিক প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়, আর মোল্লা-পুরোহিত, মন্দির-মসজিদ, শাস্ত্র-শরিয়ত, আচার-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম মানুষকে অন্ধ কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেয়। রাজশক্তি এবং পুরোহিত-মোল্লা-পাদ্রীকুল স্বীয় শাসন-শোষণকে চিরায়ত করবার জন্য ধর্মরূপী আফিম সেবনে আমজনতাকে উৎসাহিত ও বাধ্য করে। পরিশেষে ধর্মীয় কুসংস্কার নকল মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করে, এবং ধর্মান্ধতার আবরণে সামাজিক সংঘাতের মূল কারণগুলিকে সাধারণ মানুষের সচেতন মনের আড়ালে ঢেকে রাখে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিশ্বাস শিথিল না হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মৌলিক সমাধানগুলির অনুধাবন ও প্রয়োগ জনসাধারণের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

ধর্মীয় মনোভাব এবং স্বধর্ম ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকাই তার প্রমাণ। এই আন্দোলনে কংগ্রেস শামিল হলে তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশা নিয়েই তিনি খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তুরস্কে কামাল পাশা পরিচালিত সফল খলিফা বিরোধী অভ্যুত্থানের পর এ আন্দোলনের তলা থেকে মাটি সরে গেল, আর তার পরই ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। প্রকৃতপক্ষে খিলাফত আন্দোলনের সমর্থনে সারা দেশে বক্তৃতার সময় মহাত্মা গান্ধী ও আলি ভাইয়েরা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কথা বোঝাতে গিয়ে একদিকে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় কুসংস্কারকে জাগিয়ে তুলেছেন, আর অন্যদিকে পরোক্ষে এবং অজান্তে দুই ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পার্থক্য সম্বন্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে ধর্মীয় ভ্রান্ত চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র। একই কারণে গান্ধীজীর সারা জীবনের প্রার্থনা-সভায় এবং অন্যত্র ধর্মীয় আবেদনের ফলে এদেশে প্রকৃতপক্ষে ধর্মান্ধতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ-ধরনের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি পরিণামে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক

ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সন্ধান করতে হবে। রাষ্ট্রীয় আর্থিক নীতির পরিবর্তন ও দাঙ্গা ও দেশ বিভাগে ইন্ধন যুগিয়েছে। প্রত্যেক ধর্মই বিজ্ঞান ও যুক্তি বিরোধী অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ধর্ম সংস্কারকদের মতে সব ধর্মই মূলত সমান হলেও অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরা এ-কথা মেনে নিতে পারেন না, কারণ তাঁদের শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অন্যরূপ কথা লেখা আছে। তাঁদের পক্ষে একই সঙ্গে স্বধর্মে উৎসাহী হওয়া এবং সর্বধর্মের সমানতায় বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজের পক্ষেও এ-ধরনের দার্শনিক তত্ত্ব মুখের বুলি মাত্র, প্রকৃত ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যার কোনই সম্পর্ক নেই। যে ধর্ম স্বধর্মীদের অগণিত উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে ভাগ করেছে, তার নেতারা যখন সর্বধর্মের সাম্যের বাণী প্রচার করেন, তখন তা বিশ্বাসযোগ্য কিংবা প্রয়োগসম্ভব হয় না। একই কারণে গান্ধীজী সমর্থিত ধর্মভীরু, এবং ধর্মাচারী হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে স্বধর্মে অচল থেকে সুখী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। উভয়ে ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে বিজ্ঞান ও মানবতাধর্ম গ্রহণ করলেই এ ধরনের সামাজিক বিপ্লব সম্ভব।

ধর্ম সামাজিক সংঘাতের মূল কারণ নয়। কিন্তু অনেক রকম সংঘাতকে ধর্ম তথাকথিত সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়, অন্ধ আবেগে সংঘাতকে তীব্রতর করে তোলে। ধর্মবিশ্বাস পরিহার করে বিজ্ঞান ও যুক্তিধর্মে আস্থাবান হলেই মানুষ নিজের প্রকৃত পরিচয় এবং সমাজের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারবে। আর তখনই সামাজিক সংঘাতের মৌলিক কারণগুলি তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে, এবং নূতন বিপ্লবী চেতনায় উম্বুদ্ধ হয়ে শক্তিমান মানুষ সংঘাতের মূলোচ্ছেদে অগ্রণী হবে। ধর্মের যেখানে অবসান, সাম্প্রদায়িকতারও সেখানে মৃত্যু। ধর্মের অলীক দর্শন ও ভ্রান্ত চেতনার অবিদ্যাকে উত্তরণ করলেই মানুষ অপরের মধ্যে নিজের সন্ধান পাবে। ধর্মের কালো চশমা খুলে ফেললেই সে দেখতে পাবে জীবনের রং আর মানবতার সৌন্দর্য। ধর্মহীন মানুষের অন্তরে তবুও হয়তো জেগে থাকবে বিরাট এক অনন্ত জিজ্ঞাসা। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা নকল মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করবে না। মানুষের দৃষ্টিতে সে করবে নূতন আলোর সঞ্চার। করুণার অশ্রুবিন্দুতে হয়তো বা রচনা করবে গণদেবতার অধিষ্ঠান।

ভারতের নারী

চাঁদের সুষমা, পারিজাতের কোমলতা, ধরণীর তিতিক্ষা, মন্দাকিনীর ছন্দ আর অমরাবতীর প্রেমে রচিত ভারতের নারী। ইতিহাসের কোন এক কালজয়ী মুহূর্তে এদেশের কোন জ্ঞানতপস্বী এই সত্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন যে নারীই শক্তির উৎস। সর্বদেশে সর্বকালে নারী প্রগতির সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে দেশে বা সমাজে নারী অবহেলিতা, নিপীড়িতা এবং লাঞ্ছিতা, ইতিহাসের খরস্রোতে অনিবার্য গতিতে অভীষ্টের দিকে ধাবমান না হয়ে সে পংকিল আবর্তে আবদ্ধ গতিহীন জলাশয়ে পরিণত হয়। আমাদের এই ভারতবর্ষ আজ যে জগতের এক পেছিয়ে পড়া দেশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, কল্পলোকের মহীয়সী শক্তি-স্বরূপিনী নারীর সঙ্গে বাস্তব পরিবেশে এদেশের নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থার বিন্দুমাত্র মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে এদেশের শীর্ণকায়, খর্বকায় বীরপুরুষদের রচিত ধর্মীয় অনুশাসনে নারী সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক শোষিত, নির্যাতীত এবং শৃংখলিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় নারীর শৃংখলমোচন ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তাই ভারতের মুক্তি ও প্রগতি সম্ভব নয়।

যে বৈদিক সভ্যতায় নারীর শক্তিময়ী মূর্তি কল্পিত হয়েছিল, সে সভ্যতায় নারীর এ রূপ বাস্তব ক্ষেত্রেও বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছিল। সেখানে অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, অবাঞ্ছিত বিবাহ, পর্দাপ্রথা, বিবাহিত জীবনে অসম মর্যাদা, সতীদাহ, বৈধব্যের অনুশাসন প্রভৃতি অবিচার ও পরাধীনতায় নারী জাতি শৃংখলিত ছিল না। শিক্ষা, স্বাধীন প্রেম ও বিবাহ, আব্রুহীন মুক্ত জীবন, সম মর্যাদা, বিধবা বিবাহ এমনকি পাণ্ডিত্য এবং শৌর্যবীর্যে নারীর অবদানের অনেক নজির বৈদিক যুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানে, অনুসন্ধিৎসায়, শিল্পকলায়, সাহিত্যে, দর্শনে এবং মুক্ত চিন্তায় ও জীবনে বৈদিক যুগে ভারতীয় সভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশ তাই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। স্ত্রীস্বাধীনতার সঙ্গে এই সভ্যতার বহুমুখী বিকাশ ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতের এই মত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় যে মধ্যযুগে আরব আক্রমণের সময় থেকেই বিধর্মীদের ভয়ে এদেশে প্রথম স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নানাবিধ গোঁড়ামি ও কুসংস্কার শুরু হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগের পর থেকেই, বিশেষত মৌর্য-যুগের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্থায়ী কুসংস্কারের গোড়াপত্তন হয় এবং এদেশের সমাজে নারীর হীনস্থানও তখন থেকেই রচিত হয়। একমাত্র পর্দাপ্রথাই মধ্যযুগে প্রবর্তিত হয়। আর তাও সম্ভবত বিধর্মীদের ভয়ে ততটা নয়, যতটা তাদের, বিশেষত অভিজাত শাসক শ্রেণীর অনুকরণে। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন

অনুশাসনের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে নারীর জন্মগত হীনস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। হিন্দু সমাজের ভিত্তি মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে নারী শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রমতে নারীর কোন স্বাধীন সত্তা নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে এক গৃহপালিত পরাধীন প্রাণী বিশেষ।

বৈদিকোত্তর যুগে হিন্দু কিংবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুশাসন নারীর জন্মগত হীন-স্থানের অন্যতম কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সন্তান উৎপাদনে জীববিজ্ঞান সম্মত নারীর প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং নারীকে শুধু-মাত্র পুরুষ কর্তৃক সন্তান সৃষ্টির একটি জীবন্ত আধার মনে করতেন। ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করলে কখনো এমন ধারণা হয় না যে প্রজননে বিজ্ঞান-সিদ্ধ নারীর প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে এদেশের বুরবক শাস্ত্রকারদের কোন সচেতনতা ছিল। মনু বলেছেন যে সন্তানের জনক হবার জন্যই ভগবান পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে গর্ভে ধারণ করবার জন্যই সৃষ্টি করেছেন নারীকে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই ছিল নারীর যথার্থ স্থান সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারদের বদ্ধমূল ধারণা।

নারীকে একটি যৌনযন্ত্র মাত্র মনে করবার এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই তার আজীবন পরাধীনতার তত্ত্বের অন্যতম উৎস। যেহেতু সন্তান উৎপাদন করাই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, অতএব ঋতুমতী হওয়া মাত্রই কিংবা তারও আগে কিশোরী মেয়ের বিবাহ ধর্মশাস্ত্রীয় যুগ থেকে হিন্দু সমাজে সাধারণত সমর্থিত হয়েছে। বাল্যবিবাহের এখানেই উৎপত্তি। ঋষি বৌধায়নের বিধান অনুযায়ী কন্যা ঋতুমতী হবার আগে যে পিতা তাকে পাত্রস্থ করেন না, অবিবাহিতা অবস্থায় সে যতবার ঋতুমতী হয় পিতা ততবার গর্ভপাতের মহাপাতকে নিমগ্ন হন, সে যুগে যা নাকি নরহত্যার চেয়েও গুরুতর বলে গণ্য হত। মনু অনুশাসন দিয়েছেন যে, বিবাহের সময় পাত্রের বয়স যেখানে চব্বিশ, সেখানে পাত্রীর বয়স হবে আট, আর পাত্রের বয়স যদি হয় ত্রিশ, তবে পাত্রীর বয়স বারো। একই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে নারীর যে কোন স্বাধীন মানসিক সত্তা ও হৃদয় আছে, ধর্মশাস্ত্রগুলিতে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথমত, মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে পিতা অথবা ভ্রাতারা কন্যাকে যে পাত্রের কাছে সম্প্রদান করবেন তাকেই পতিদেবতা রূপে গ্রহণ করতে হবে এবং আজীবন বিনা দ্বিধায় তার সেবা করতে হবে। মনুর বিধানে স্বামী যদি সম্পূর্ণ গুণহীন, দুশ্চরিত্র এবং লম্পট হন, তথাপি তাকে সর্বদা দেবতাজ্ঞানে পুজো করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে কামাসক্ত স্বামীর প্রস্তাবে কখনো সম্মত না হলে স্ত্রীকে খালি হাতে কিংবা লাঠি দিয়ে প্রহার করবার অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা পুরুষের বহুবিবাহ সমর্থন করলেও নারীর জন্য এক বিবাহ এবং স্বামীর মৃত্যুর পর চিরবৈধব্য ও কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের বিধান দিয়েছেন। মনুর মতে বহুবিবাহিত স্বামীর কোন স্ত্রী তার সংসারে থাকতে না চাইলে তাকে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখা হবে, কিংবা পরিবারের সমস্ত লোকজনের সামনে চিরতরে বাড়ী থেকে বার করে দেয়া হবে। চতুর্থত, শাস্ত্রকারেরা নিঃসন্তান স্ত্রীর জন্য বর্বরোচিত নিয়োগ প্রথার বিধান দিয়েছেন। পঞ্চমত, তাঁরা বেদপাঠ ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অধিকার থেকে নারী জাতিকে বঞ্চিত করেছেন। পরিশেষে বলা যায় যে, শাস্ত্রকারেরা সাধারণত নারীর স্থান শূদ্রদের অর্থাৎ সমাজের তথাকথিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর সমতুল বলে ঘোষণা করেছেন।

মনু এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ অবশ্য অনেক সময় সাধারণভাবে নারী-জাতিকে সম্মান জানাবারও বিধান দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ মনু বলেছেন, যে সংসারে নারী সম্মান লাভ করেন না, কিংবা দুঃখে থাকেন, সে সংসার উচ্ছন্ন যায়।

কিন্তু একই সঙ্গে আবার নারীদের সর্বদা দাবিয়ে রাখবার, অবিশ্বাস করবার, কড়া পাহারায় রাখবার এবং হাঁড়ি-কড়া মাজা প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় ভারী কায়িক শ্রমের দায়িত্ব দেবার বিধান এবং উল্লিখিত অপরাপর অমানুষিক বিধানও দিয়েছেন। ভারত-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এ এল বেশম যথার্থই লিখেছেন, **"The ancient Indian attitude to women was in fact ambivalent. She was at once a goddess and a slave, a saint and a strumpet."**

অধ্যাপক বেশম যে কথা যোগ করেননি তা হল এই যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে নারীকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করলেও বাস্তব জীবনে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অনুশাসন তার জন্য দাসীর স্থানই নির্দিষ্ট করেছিল।

নারী জাতিকে শুধুমাত্র এক হৃদয়হীন যৌনযন্ত্র রূপে গণ্য করবার পেছনে অবশ্য যৌনজ্ঞানের অভাব ছাড়াও আরেকটি গভীরতর কারণ আছে, এবং তা অর্থনৈতিক। এদেশে প্রাচীন কাল থেকেই কন্যা-সন্তানের চেয়ে পুত্র-সন্তানের সমাদর বেশী, কারণ শ্রমিক হিসেবে এবং আজীবন নির্ভরতার দিক থেকে পুত্র-সন্তানের মূল্য অনেক বেশী, যদিও এই আর্থিক কারণকে ধামাচাপা দেবার জন্য ধর্মব্যবসায়ী শাস্ত্রকারেরা এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে, পুন্নামক নরক থেকে ত্রাণ করে বলেই পুত্রের একান্ত প্রয়োজন। বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনই যেহেতু নারী-জীবনের উদ্দেশ্য, পিত্রালয়ে অনূঢ়া তরুণী হিসেবে তাই তার কোন আর্থিক মূল্য নেই। বরঞ্চ পরিবারের উপর সে এক বিরাট আর্থিক বোঝা স্বরূপ। বিবাহিতা নারী হিসেবে সে একাধারে স্বামীর শয্যা-সঙ্গিনী এবং সমস্ত পরিবারের অবৈতনিক দাসী। অতএব পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয় উভয় দিক থেকেই যত শীঘ্র কিশোরী কন্যার বিবাহ হয়, আর্থিক দিক থেকে ততই লাভজনক। ধর্মের আবরণে ঢাকা এই নগ্ন আর্থিক স্বার্থের আরেকটি উদাহরণ তথা-কথিত দেবদাসী প্রথা, যা ছিল এদেশে প্রাচীন কাল থেকে মন্দিরে গণিকাবৃত্তির আরেক নাম। এই প্রথার মাধ্যমে লম্পট পুরোহিতকুল শুধু যে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতেন তাই নয়, মোটা আর্থিক লাভও করতেন। মধ্যযুগীয় বিদেশী পর্যটক মহা-পণ্ডিত আলবেরুনীর মতে মন্দিরগুলো থেকে মোটা রাজস্ব আদায়ের লোভে অন্য কোন কোন দেশের মত ভারতবর্ষেও রাজারা এই দেবদাসী প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এবং প্রধানত তার ফলেই এই প্রথা বর্ধিষ্ণু রূপ ধারণ করেছিল।

এদেশের ইতিহাসে ধর্মের নামে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্থিক কারণে নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ সতীদাহ প্রথা। কোন সুস্থচিত্ত মানুষই একথা বিশ্বাস করবেন না যে বিশেষ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র ছাড়া স্বেচ্ছায় কোন নারী মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হতে চাইতেন। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আত্মীয়-স্বজনেরা আর্থিক কারণে সদ্য বিধবাকে জীবন্ত দগ্ধ করতেন। এই আর্থিক কারণ ছিল প্রধানত দু-রকম। প্রথম কারণ মৃত স্বামীর এবং সদ্য বিধবার যাবতীয় সম্পত্তি ও অলংকারাদি আত্মসাতের বাসনা। দ্বিতীয় কারণ, সদ্য বিধবার আজীবন ভরণপোষণের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা। একই কারণে পরবর্তী কালেও বিধবাদের একাধারে খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতিতে অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনে আর অহর্নিশি বিরাট যৌথ পরিবারের দাসীবৃত্তিতে বাধ্য করে আমরণ নিদারুণ শোষণের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হত। যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে সদ্য বিধবা সতীদাহে সম্মত হতেন, বৈধব্যের চিরস্থায়ী এবং দুর্নিবার ভয়াবহতাই সম্ভবত ছিল তাদের সম্মতির মূল কারণ। অথচ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যখন আইন পাশ হয়, তখন একশ' কুড়ি জন হিন্দু পণ্ডিত এক যৌথ চিঠিতে লর্ড বেন্টিংকের নিকট এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে বলেন যে, সতীদাহ হিন্দুধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এহেন গুরুতর ধর্মের বিষয়ে ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ করা

অত্যন্ত অসমীচীন। বিধবাদের নিষ্ঠুর শোষণের নগ্ন আর্থিক কারণগুলিকেও শাস্ত্রকারেরা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা, পতিভক্তি, পরলোক প্রভৃতি ধর্মীয় তত্ত্বের অন্তরালে ঢেকে রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ইসলাম ধর্মেও নারীর আজীবন পরাধীনতা অনস্বীকার্য, এবং তার পেছনেও আর্থিক স্বার্থের প্রাধান্য বিদ্যমান। কোরাণে বলা হয়েছে যে, মেয়েদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্বের অধিকার আছে, কারণ আল্লাহ নারীর চেয়ে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন, এবং পুরুষেরা নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থব্যয় করেন। ভালো মেয়েরা স্বভাবতই পুরুষের বাধ্য হয়ে থাকেন। কোন নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হন, তবে তাকে তিরস্কার করবার, পৃথক শয্যায় শুতে বাধ্য করবার এবং প্রহার করবার অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে। শিশুবিবাহও আরবদেশে বহুল প্রচলিত ছিল এবং কোরাণে এর সমর্থন রয়েছে। তবে কোন কোন ব্যাপারে নারী জাতি সম্বন্ধে কোরাণের বিধান হিন্দুশাস্ত্রগুলির চেয়ে অনেক বেশী উদার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদিও কোরাণে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে অক্ষম হলে পুরুষ মাত্র একটি বিবাহই করবে। কোন হিন্দু শাস্ত্রে এরকম বিধান নেই। দ্বিতীয়ত, নারীদের সম্পত্তির অধিকার কোরাণে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে নারীর সম্পত্তির অধিকার নেই। তৃতীয়ত, কোরাণে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কোন দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দিলে স্বামীর পক্ষের একজন এবং স্ত্রীর পক্ষের একজনকে মধ্যস্থ রেখে আলোচনায় বসতে হবে। চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদের আগে প্রতীক্ষার সময় নির্দেশ করা হয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্বামীর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে ভাতা দেবার বিধান রয়েছে। উপরন্তু স্বামীই স্ত্রীকে যৌতুক দেবেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও তা ফেরৎ নেয়া চলবে না। কোরাণে বিধবা বিবাহেরও সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। তথাপি সাধারণ ভাবে বলা যায়, এদেশের দুই প্রধান ধর্মগোষ্ঠীতেই নারী নির্যাতনের শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে, এবং এ নির্যাতনের আর্থিক ও সামাজিক কারণগুলোকে ধর্মীয় তত্ত্বের আবরণে ঢেকে রাখতে ধর্মব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন।

॥ ২ ॥

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে যে ধর্ম সংস্কারের প্রয়াস আরম্ভ হয়, তার মধ্যে নারী জাতির দুরবস্থা সম্বন্ধেও সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন রায় আইনের মাধ্যমে সতীদাহ বন্ধ করবার বিরোধিতা করে থাকলেও অন্যভাবে এ প্রথা বিলোপের এবং সাধারণভাবে নারী প্রগতির পক্ষে ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম সমাজ পর্দাপ্রথা বর্জন, বিধবা বিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহের অবসান, শিশুবিবাহ বন্ধ এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রের প্রার্থনা সমাজও প্রধানত মাধব গোবিন্দ রানাডের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবদান রেখেছে। গুজরাটে দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে আর্য সমাজও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলন করে। অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে থিওসফিক্যাল সোসাইটিও নারী প্রগতির সপক্ষে কাজ করে। নারী প্রগতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বেহরামজী মালাবারীর অবদানও সর্বজনবিদিত। প্রধানত বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার ফলেই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। আর তেমনি

ভাবে ১৮৯১ সালের বিবাহের বয়স সংক্রান্ত আইন ছিল মালাবারীর চেষ্টারই ফলশ্রুতি।

এই শতকের প্রথম ভাগে নারী প্রগতির আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সংগে যুক্ত হয়ে আরও কিছুটা শক্তি সঞ্চার করে। রমাবতী রানাডে, বরোদার গাইকোয়াড়, রায়সাহেব হরিদাস সারদা প্রভৃতি নারী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা অ্যানি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু এবং হেরাবাঈ টাটা নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯২৩ সালে ভারতীয় মহিলা সমিতি (Women's Indian Association) মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে নারী প্রগতিতে বিশেষ অংশগ্রহণ করে। ১৯১৪ সালে সর্বভারতীয় মুশ্লিম মহিলা সভা (All India Muslim Ladies' Conference) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১৯ সালের লাহোর অধিবেশনে পুরুষের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করে। ১৯২৮ সালে ভূপালের বেগম এই সভার সভানেতৃত্ব করেন এবং নিজ রাজ্যে নারী প্রগতির সহায়ক বহু সংস্কার সাধন করেন। ১৯২৬ সনে সর্বভারতীয় মহিলা সভা (All India Women's Conference) প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং আজ পর্যন্ত এই সংগঠন নারী প্রগতির সপক্ষে আন্দোলন ও গঠনমূলক কাজ করে চলেছে।

আধুনিক ভারতে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন তিনি মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী ছিলেন নারী পুরুষের নিঃশর্ত ও সমান স্বাধীনতার সমর্থক, বাল্যবিবাহের ঘোরতর বিরোধী, আর স্বাধীন প্রেমের ভিত্তিতে যুবক-যুবতীদের পরস্পরের জীবনসাথী বেছে নেবার পক্ষপাতী। বিধবা বিবাহ এবং নৈতিক কারণে বিবাহ বিচ্ছেদেরও তিনি পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নারী প্রগতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সম্ভবত এই যে তিনি অগণিত ভারতীয় নারীকে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। খাদি ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্যসূচির মাধ্যমে আবালবৃদ্ধবনিতা আমজনতাকে ব্যাপক গণ আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার করে জাতীয় শক্তির সামূহিক বিকাশ সাধনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল কথা। অন্তঃপুরবাসিনী ভারতীয় নারী গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করে শুধু যে ঘরের বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছেন তাই নয়, নিজের মহীয়সী শক্তি সম্বন্ধেও নূতন সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বস্তুত, বর্তমান ভারতে নারীশক্তির যেটুকু বিকাশ হয়েছে, তার কৃতিত্ব বহুলাংশে মহাত্মা গান্ধীরই প্রাপ্য। যে পরিবেশে আজ কিছু সংখ্যক ভারতীয় নারী সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তা প্রধানত গান্ধীজীরই সৃষ্টি। একাধারে নারী প্রগতি ও পেছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলোর উন্নতির প্রতীক হিসেবে একজন হরিজন নারীকে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করাই ছিল গান্ধীজীর স্বপ্ন। স্বাধীনোত্তর যুগে হিন্দু বিবাহ আইন, অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক আইন এবং শহরাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে এদেশের নারী সমাজের দুরবস্থার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়েছে। কিন্তু তার ফলে বিপুল ভারতীয় নারী জাতির, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এবং এদেশের মুসলমান নারীদের সামগ্রিক দুরবস্থার নিরসন হয়নি। অহল্যাদেশ আজও তাই মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

॥ ৩ ॥

আজও নারী জন্ম থেকেই পিতৃগৃহে অবাঞ্ছিতা। কারণ, বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনই আজও এদেশে নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রূপে সাধারণত গণ্য হয়, এবং এর বাইরে নারীর কোন স্বাধীন সত্তা, কর্মসাধনা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়োজন আছে, খুব অল্প সংখ্যক মাতাপিতাই তা মনে করেন। ফলে পিতৃগৃহের দেনার খাতাতেই শিশুকন্যার হিসেব লেখা থাকে। তার ভরণপোষণের ব্যয়, শিক্ষার ব্যয়, সবই অপচয়। তারপর তার বিবাহে প্রচুর অর্থব্যয়, এবং বিবাহের পরেও অনন্তকাল ধরে জামাই-ষষ্ঠী, পূজাপার্বণ, সাধভক্ষণ, সন্তানদের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি অসংখ্য কুপ্রথার কবলে পড়ে সারাজীবনের খরচের বোঝা পিতামাতার আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এককালে এ কারণে জন্মসময়েই অসংখ্য নারীশিশুকে হত্যা করা হত। আজ আর সে অবস্থা ঠিক নেই, কিন্তু কন্যাকে এখনও দায় হিসেবে গণ্য করাই স্বাভাবিক রীতি। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে তাই মেয়েকে শুধু ততটুকুই শিক্ষা দেয়া এবং নাচ-গান প্রভৃতি শেখানো হয়, যার ফলে সে সহজে বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠে আর আর্থিক বোঝা হিসেবে কিঞ্চিৎ হালকা হয়। আর বিপুল এ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক পরিবারে বিবাহের জন্য কন্যার দশ-বারো বৎসর বয়স হওয়া ছাড়া আর কোন গুণেরই প্রয়োজন হয় না বলে বিবাহের আগে অশিক্ষা, অনাদর আর পরিবারের দাসীবৃত্তি ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না।

কিন্তু বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন এদেশে নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গণ্য হলেও বিবাহ প্রথাকে মানবতাধর্মী এবং সুন্দর করে গড়ে তুলবার উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা আজও হয়নি। বরঞ্চ বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বিবাহ এ সমাজে এক অশোভন, বর্বর ও বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। পঞ্চাশ বৎসর আগেও আট বছরের মেয়ের সংগে ষাট বৎসরের বৃদ্ধের বিবাহ হত। লেখকের পরিচিতা এক বৃদ্ধা আট বৎসর বয়সে তাঁর দুই বড় বোনের সঙ্গে একযোগে এক বৃদ্ধ স্বামীর সংগে বিবাহিতা হন। তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় বোনের বয়স তখন তেরো, এবং একমাত্র সেই বিবাহের সময় স্বামীর হাত স্পর্শ করেছিল। বাকী দুই বোন শুধু পেছনে লাইন করে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয়া প্রথমার হাত ধরে আর তৃতীয়া দ্বিতীয়ার হাত ধরে। বিয়ের ছ' মাসের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে এই তিন বালিকা বিধবা মুণ্ডিতমস্তক, শ্বেতবসনা, পাথরের থালায় শাকাহারী এবং অর্ধাহারী হয়ে আজীবন আত্মীয়কুলের দাসীবৃত্তি করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। যৌবন না পেরোতেই তাদের প্রত্যেকের দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিল। ক্যাথারিন মেয়ো সম্ভবত ভারত বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু তাঁর Mother India গ্রন্থে এদেশের সমাজে বালিকাদের অমানুষিক নির্যাতনের যে করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন, তা স্বাধীনতার আগে পর্যন্তও বহুলাংশে সত্য ছিল। বর্তমানে এই নির্যাতনের মাত্রা সম্ভবত বেশ কিছুটা কমেছে। কিন্তু শৈশবে কন্যাকে পাত্রস্থ করলে তার ভরণপোষণের ব্যয় এবং যৌতুকের পরিমাণ দুই-ই কম হয় বলে বাল্যবিবাহ ও বালিকা বধূর নিষ্ঠুর নির্যাতন আজও এ দেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চলছে। আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও সামাজিক চেতনা এবং আন্দোলনের অভাববশত বাল্যবিবাহ আজও বহুল প্রচলিত, এবং একমাত্র শহরবাসী মধ্যবিত্ত পরিবার ছাড়া আর প্রায় সর্বত্রই বাল্যবিবাহ এখনও অবাধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার, শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার এবং ক্ষীণজীবী সন্তানের জন্মও অনেকাংশে এ অমানুষিক কুপ্রথারই ফলশ্রুতি।

বয়ঃপ্রাপ্তা নারীদের বিবাহেও সুন্দরের চেয়ে অসুন্দরের প্রকাশই প্রকটতর। বিবাহে

অসুন্দরের আত্মপ্রকাশের প্রধান কারণ এই যে, বৈদিক সভ্যতায় প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্বাধীন প্রেমের ভিত্তিতে স্বনির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে বিবাহের পরিবর্তে বর্তমানে এদেশে পিতামাতা এবং সমস্ত আত্মীয়কুল দ্বারা পাত্র নির্বাচিত হয়। এর ফলে পাত্র-পাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রেমের অঙ্গীকার এবং যুক্তি ও মানবতাধর্মের ভিত্তিতে মহান সম্ভাবনাময় করে তুলবার পরিবর্তে অভিভাবকদের, এমনকি আত্মীয়সমাকুল উপজাতি বিশেষের কায়েমী স্বার্থ এবং অন্ধ কুসংস্কারের উপরই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রথমত, জীবনসাথী হিসেবে শ্রেষ্ঠ দম্পতি নির্বাচনের পরিবর্তে ধর্মভেদ, জাতিভেদ, উপজাতিভেদ, গোত্রভেদ, মেলভেদ প্রভৃতি বিজ্ঞান ও মানবতাবিরোধী কুসংস্কারের ভিত্তিতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হয়। এ জাতীয় অসংখ্য ভয়াবহ কুসংস্কারের বিচারে উত্তীর্ণ পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা স্বভাবতই এত নগণ্য যে আদর্শ বিবাহ, এমনকি সুস্থ বিবাহও এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, এই কুপ্রথার ফলে কনে-দেখা নামক প্রহসনকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার ভ্রষ্টাচার গড়ে উঠেছে। কনের রূপ দেখা, কথা বলা দেখা, চুল দেখা, হাত-পা দেখা, সর্বাঙ্গের কোমলতা পরীক্ষা করা প্রভৃতি ব্যভিচারের মাধ্যমে বয়স্ক অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনদের নানারূপ বিকৃত মানসিক প্রবৃত্তির তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে পরস্পরের জীবনসাথী হবার উপযুক্ততার বিচার হয় না। তৃতীয়ত, অভিভাবক এবং উপজাতিকুলের কায়েমী আর্থিক স্বার্থই এরূপ বিবাহে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পাত্র-পাত্রীকে উপলক্ষ করে উভয় পক্ষের লালসাগ্রস্ত অভিভাবকেরা কেনাবেচা ও দর কষাকষি শুরু করেন। পণ-প্রথার কলুষ এদেশে লক্ষ লক্ষ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সর্বস্বান্ত করে চলেছে। ভারতবর্ষে অগণিত কৃষক-মজুর পরিবারের চরম আর্থিক দুরবস্থার অন্যতম কারণ এই যে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা তাদের একমাত্র সম্বল সামান্য জমিজমা কিংবা হাঁড়ি-কলসী বিক্রি করে অথবা মহাজনদের কাছে বন্ধক রেখে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং সারা জীবনে এ দেউলিয়া অবস্থা থেকে আর কখনো নিষ্কৃতি পান না। কনের ভবিষ্যৎ জীবনও অনেকাংশে যৌতুকের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কারণ, যে বধূ যত বেশী যৌতুক নিয়ে শ্বশুরালয়ে আগমন করেন, সেখানে তার ততই বেশী সমাদর হয়। এক পরিবারের একাধিক গৃহবধূ থাকলে তাদের তুলনামূলক মর্যাদা স্থির হয় বিবাহের সময় প্রদত্ত যৌতুক এবং পিত্রালয়ের আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে। চতুর্থত, বিবাহের পরেও সারাজীবন পূজাপার্বণ, জামাইষষ্ঠী, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন উপনয়ন এবং আরও বহু কল্পনীয় ও অকল্পনীয় উপলক্ষ সৃষ্টি করে বধূর পিত্রালয় থেকে যথাসম্ভব অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয়। আর যে বধূর পিত্রালয় থেকে এই সরবরাহ ব্যবস্থা শিথিল হয়, শ্বশুরালয়ে তার মর্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী। সে শ্বশুরালয় আপাতদৃষ্টিতে যতই শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত হোক না কেন।

ভারতীয় নারীজীবনের নিষ্ঠুর কাহিনীর নিষ্ঠুরতম অংশ সম্ভবত হিন্দু বিধবাদের, বিশেষত তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিধবাদের অবমানবীয় জীবন। আগেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন কাল থেকেই বিধবাদের নির্যাতনের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক, অর্থাৎ বিধবাদের সম্পত্তির প্রতি আত্মীয়কুলের লোভ এবং এই অনাথাদের স্বাভাবিক ভরণ-পোষণের ব্যয় বহনে অনিচ্ছা। আজও এ অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হলেও বিধবাদের অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধন আজও অব্যাহত। শুভ্রবস্ত্র পরিধান, নিরাভরণ বেশ, নিরামিষ অর্ধাহার, কারণে অকারণে নিয়মিত উপবাস, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মস্তক মুণ্ডন ও পাথরের থালায় আহার আজও বিধবাদের জীবনের অলঙ্ঘনীয় বিধান। তরুণী বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ হিন্দু সমাজে আজও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। কুমারী মেয়ের দোজবরে বিবাহ বহুল প্রচলিত, এবং সম্পূর্ণ

বিধিসম্মত বলে গণ্য হয়। কিন্তু সমাজের স্বনির্বাচিত অভিভাবকেরা ধর্মভ্রষ্ট হবার ভয়ে বিধবা নারীর ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রয়োগ করতে সম্পূর্ণ অপারগ। বড় বড় শহরে আজকাল কদাচিৎ এরূপ বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। এদিকে ধর্মের নামে এই কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবারের অবৈতনিক দাসীবৃত্তি করাই বিধবাদের প্রধান কাজ। ধর্মীয় আচারের বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে হিন্দু বিধবাদের যে অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতন চলছে, সে দুর্বচনীয় ইতিহাস শুধু অশ্রুজল আর দীর্ঘশ্বাসেই রচিত হচ্ছে। ধর্মীয় ভণ্ডামির এই মুখোশ ছিঁড়ে ফেললে পৃথিবীর আর সব দেশের, এবং এদেশের বৈদিক যুগের বিধবা এবং মুশিলম বিধবাদের মত হিন্দু বিধবাদেরও আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ এবং অন্যান্য সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবার পথে কোন অন্তরায়ই থাকতে পারে না। কারণ ধর্মীয় অলীক দর্শনের আবরণ ভেদ করে শোষণের নির্লজ্জ স্বরূপ সেদিন মানুষের চৈতন্যে তীব্র কষাঘাত হানবে।

অবিবাহিতা নারীদের জীবনও এদেশে বিশেষ বিড়ম্বনাময়। প্রাচীন কাল থেকে এদেশে বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য হবার ফলে অবিবাহিতা নারীর জীবন এ সমাজ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। তাই দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অথবা উন্মাদ স্বামীর সঙ্গে, বহুস্ত্রীর মালিকের সঙ্গে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধের সঙ্গে, এমনকি গাছের সঙ্গে তরুণীদের বিবাহের রীতি কয়েক দশক আগেও এদেশে প্রচলিত ছিল। একমাত্র গাছের সঙ্গে এবং হিন্দু সমাজে বহুস্ত্রীর মালিকের সঙ্গে বিবাহ ছাড়া বাকিগুলো আজও কমবেশী প্রচলিত আছে। এরূপ অবস্থার আরেকটি কারণ এই যে, বড় বড় যৌথ পরিবারের পুরুষদের দৌরাত্ম্যে কুমারী মেয়েদের কৌমার্য রক্ষা করা কঠিন হত। আর কুমারী মেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে তার পক্ষে হিন্দু সমাজে বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভব ছিল না। তাদের সাধারণত বিষ খাইয়ে, কাপড়ে আগুন দিয়ে, গলায় ফাঁস এঁটে কিংবা জলে ফেলে দিয়ে হত্যা করে প্রচার করা হত যে তারা আত্মহত্যা করেছে। বর্তমান যুগে সে অবস্থা আর ঠিক নেই, কিন্তু নিজ কর্মসাধনায় রত বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী নারীর পক্ষে সমাজে মর্যাদার স্থান গ্রহণ করা আজও দুঃসাধ্য। সর্বত্র এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের সিঁথির দিকে আর হাতের দিকে বার বার বিরূপ কটাক্ষ হেনে তীব্র কৌতূহল ও মৌন ভর্ৎসনা জ্ঞাপন করেন। নিজের অধিকারে বাসা ভাড়া করা কিংবা নিকট আত্মীয়ের আশ্রয়ে ছাড়া অন্য কোথাও থাকা, অথবা সামাজিক পরিবেশে সমাদর লাভ করা অবিবাহিতা নারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর এসব সমস্যাও বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ ভারতে আজও কোন নারীর পক্ষে অবিবাহিত জীবন-যাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবিবাহিত পুরুষকে এদেশে সাধু-সন্ন্যাসী গণ্য করা হয়, কিন্তু অবিবাহিতা নারীকে অধঃপতিতা জ্ঞান করাই স্বাভাবিক রীতি। অথচ পৃথিবীর সব দেশেই স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও নারী প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কর্মসাধনায় রত অনূঢ়া নারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে, এবং কোন উন্নত দেশে বিবাহ না করবার ফলে তাদের অমর্যাদার অবকাশ নেই।

হিন্দু সমাজের চেয়ে এদেশের মুশিলম সমাজে নারীর অবস্থা আরও করুণ, আর তার প্রধান কারণ সম্ভবত তাদের তুলনামূলক অশিক্ষা এবং আর্থিক অনগ্রসরতা। ধর্মের নামে মুশিলম পুরুষেরা সাধারণত স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করেন, এবং তাদের নিষ্ঠুর শাসনকে অস্বীকার করে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করা মুশিলম মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব বললেই চলে। বাল্যবিবাহ শুধু যে বহুল প্রচলিত তাই নয়, এটাই সাধারণ নিয়ম। ধর্মের মুখোশ-পরা কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মুশিলম পুরুষদের বিরোধিতার মুখে সরকার এ বিষয়ে নূতন আইন প্রণয়ন থেকে বিরত থাকায় পুরুষদের

চারটি পর্যন্ত বিবাহের অধিকারও অব্যাহত আছে। কোরাণে যেসব অধিকার নারীকে দেয়া হয়েছিল, বাস্তবক্ষেত্রে তারও অধিকাংশই মুশিলম পুরুষেরা হরণ করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাস্তবক্ষেত্রে পুরুষের পক্ষে কারণে-অকারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু স্বামীর গুরু অপরাধেও নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ আদায় করা অসম্ভব বললেই চলে। পাত্রপক্ষই পাত্রীকে যৌতুক কিংবা দেনমোহর দেবে, আর সে-যৌতুক বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীরই থাকবে, এটাই কোরাণের বিধান। কিন্তু হিন্দু সমাজের কুপ্রভাবে আজকাল মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে যৌতুক আদায় করবার রীতি ক্রমশ প্রচলিত হচ্ছে। আর অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্ত্রীর পক্ষে দেন-মোহরের পুরো টাকা আদায় করা বাস্তবে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নূতন আইনের অভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও মুশিলম নারীরা পেছিয়ে রয়েছেন, কারণ মুশিলম আইনে আজও ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ সম্পত্তি লাভ করে। একমাত্র মুসলমান বিধবাদের অবস্থাই হিন্দু বিধবাদের চেয়ে অনেক উন্নত, কারণ তাদের সাধারণ জীবন-যাপনে কিংবা পুনর্বিবাহে কোন বাধা নেই।

॥ ৪ ॥

বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়, একটা জৈবিক প্রয়োজন মাত্র। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সমেত সমগ্র প্রাণী জগৎই এ কাজ করে থাকে। মানুষের মনুষ্যত্ব তার কর্মসাধনায় ও মানসিক বিকাশে, আর তা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া আর তার পরিবারের অবৈতনিক দাসীবৃত্তি করা অতএব নারীর জীবনের উদ্দেশ্য বা আদর্শ হতে পারে না। কোন নারী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, সধবা কি বিধবা, বন্ধ্যা-সন্তানবতী, নিঃসন্তান কি সন্তানসম্ভবা, তা তার গুণের কিংবা মহত্ত্বের কোন প্রমাণই নয়, তার জৈবিক পরিস্থিতির একটা অপ্রাসঙ্গিক পরিচয় মাত্র। স্বীয় কর্মসাধনায় কৃতিত্ব এবং দেশ, সমাজ ও মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে অবদানের মাধ্যমেই তার শক্তি ও প্রতিভার পরিচয়। বিবাহিত নরনারীর পক্ষে প্রয়োজন বোধে সন্তান উৎপাদন ও সংসার পালন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌথ ও সমান জৈবিক দায়িত্ব। ঘরকন্না'ও সন্তান প্রতিপালনের যাবতীয় কাজও উভয়ে সমান ভাবে ভাগ করে করাই যুক্তিসিদ্ধ। তারপর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উভয়ের ব্যক্তিত্ব, শক্তি ও প্রতিভার প্রকাশ। একমাত্র স্বামীর পরিচয়ে পরিচিতা, স্বামীর প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিতা এবং স্বামীর গরবে গরবিণী নারীর ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূল্য শুধু শূন্য। তিনি এক ব্যক্তিত্বহীন জীব বিশেষ এবং নারী প্রগতি তথা মনুষ্যজাতির প্রগতির অন্তরায় স্বরূপ। কোন বিজ্ঞানসম্মত সমাজ ব্যবস্থায় এহেন নারীর কোন স্বীকৃতি থাকা সম্ভব নয়।

নারীর কর্মসাধনা প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, এদেশের প্রায় সব কৃষক-শ্রমিক পরিবারেই, অর্থাৎ শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ পরিবারেই মহিলারা ক্ষেত-খামার, কলকারখানায় কাজ করেন, এবং এদিক থেকে তাঁরা একটা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণে সমর্থ হন। কিন্তু তাদের এ কঠোর শ্রম প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কর্মসাধনার পর্যায়ে পড়ে না, কারণ এর সংগে শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত মানসিক প্রবণতা বা যোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। এই শ্রম অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে, স্বামীর পরিবারের সামগ্রিক দাসীবৃত্তিরই নামান্তর মাত্র। তথাপি সংসার প্রতিপালনের চেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই শ্রমের

একটা বিরাট সামাজিক মূল্য আছে। আর কলকারখানায় কর্মরতা শক্তিস্বরূপিণী ভারতীয় নারী স্বীয় আর্থিক স্বাধীনতা বশত অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক জীবনে নিজেকে শুধুমাত্র একটা যৌনযন্ত্র কিংবা অবৈতনিক দাসীরূপে ব্যবহৃত হতে দেন না। উচ্চশিক্ষা বিস্তার এবং আর্থিক প্রয়োজনের ফলে বর্তমানে শহরাঞ্চলে অল্প-সংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারাও বিভিন্ন চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব চাকুরিতে ব্যক্তিগত প্রবণতার চাইতে সংসারের তাগিদই বেশী। কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারেই নারী আজও যৌনযন্ত্র এবং দাসী বিশেষ। তিনি একাধারে রান্না করেন, বাসন মাজেন, বাড়িঘর ঝাড়পোঁছ করেন, কাপড় কাচেন, ছেলে-পিলেদের খাওয়ান-পরান, স্বামীর ফাইফরমাস খাটেন এবং কোনরকমে তার আরামের অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন, এবং পরিশেষে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হন। একটানা ক্লান্ত সুরে কাজের চাকা ঘুরে ঘুরে চলবার মাঝে নিজের সম্বন্ধে একবার ভেবে দেখবার শুভ মুহূর্ত দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা তার জীবনে আর আসে না কোনদিন। রবীন্দ্রনাথ তাই তাকে জীবনশেষের শেষ জাগরণের মুহূর্তেই তার মহীয়সী শক্তি সম্বন্ধে চৈতন্য দান করেছেন। পক্ষান্তরে উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীরা অপর নর-নারীকে দাসদাসী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন বলে নিজেরা দাসী নন। কিন্তু কর্ম-হীনতা বশত আর্থিক দিক থেকে পরাধীন এবং সর্বআভরণভূষিত যৌনযন্ত্র বিশেষ। দেশ ও সমাজের বোঝাস্বরূপ এই পরগাছাকুলের তথাকথিত অভিজাত মহিলাদের কোন উচ্চ আদর্শ বা কর্মসাধনা তো দূরের কথা, শাড়ি-গয়না, গাড়ি-বাড়ি ও যৌনক্রিয়া ছাড়া জীবনে আর কোন বিষয়ে এদের কোন ইন্টারেস্টই নেই। সময় ও সুযোগ এদের আভিজাত্যের ডানা বেয়ে অবিশ্রান্ত ঝরে যায়, কিন্তু চৈতন্যের ছোঁয়া জীবনে তাদের আর লাগে না কোনদিন। ভারতীয় নারী সমাজের এরাই কলঙ্ক।

স্বাধীন ও ব্যক্তিগত কর্মসাধনা নারীর আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হলে স্বভাবতই বিবাহ আর নারীজীবনের উদ্দেশ্য বলে গণ্য হবে না, শুধু একটা জৈবিক প্রয়োজন রূপে গৃহীত হবে মাত্র। কোন নারী অবিবাহিতা, বিবাহিতা কি বিধবা, তার এই জৈবিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত কর্মসাধনায় সাফল্য ও প্রতিভার পরিচয়েই তিনি নিজ অধিকারে দেশে ও সমাজে সম্মানের আসন অধিকার করবেন। এ বিষয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন জন্মগত পার্থক্য নেই। যা কিছু পার্থক্য তা শুধু ভ্রান্ত সামাজিক আচার-বিচারের, বিশেষত ধর্মীয় কুসংস্কারেরই ফলশ্রুতি। যে নারীর জীবনে কোন স্বাধীন উদ্দেশ্য বা কর্মসাধনা নেই, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথও রুদ্ধ, তিনি যে-পুরুষের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন। অপরপক্ষে, যে নারী স্বীয় কর্মসাধনায় জীবন অতিবাহিত করছেন, তিনি কোন পুরুষ নামক জীবের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও স্বগৌরবে মহীয়সী। সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন নারী-জীবনের এক মহান আদর্শ, এ থিওরি নারীকে বশীভূত রাখবার উদ্দেশ্যে এদেশের গৃহকর্মবিমুখ ও কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন পুরুষদের একটা হাতিয়ার মাত্র। এই উদ্ভট তত্ত্বকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলে অবমানবীয় জীবজন্তুর সঙ্গে মনুষ্য সমাজের কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা বশত এদেশের নারী সমাজের একাংশও এই অপ-প্রচারের শিকার হয়েছে। নারী শুধু পুরুষের ছায়া নয়, স্বীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তি-ময়ী স্বাধীন কায়া, স্বতঃসিদ্ধ এই সত্য স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত নারী জাগরণ সম্ভব নয়।

নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও কর্মসাধনার আদর্শ গৃহীত হলে স্বভাবতই বিবাহও আর পিতামাতা এবং আত্মীয়সমাকুল উপজাতির একটা কেনা-বেচার ব্যাপার থাকবে না। স্বাধীন প্রবণতায় জীবনসাথী বেছে নেবার অধিকার স্বভাবতই স্বীকৃত হবে।

ফলে বর্তমানের কলুষিত বিবাহ ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা হবে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ প্রেমের। আর স্বাধীন প্রেমের অভিষেকের সে শুভলগ্নই হবে এদেশের পরাধীন, নির্যাতীত ও শোষিত নারীজীবনের সংক্রান্তি। অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অবশ্য নরনারীর স্বাধীন ভালোবাসার বিরুদ্ধে এই যুক্তি উত্থাপন করবেন যে, এর ফলে চিরসুখের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে না। পরন্তু পরিবারের স্থিতিশীলতা হ্রাস পাবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যেমন হয়েছে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশে। তথ্য হিসেবে এ আংশিক সত্য হলেও তত্ত্ব হিসেবে বুদ্ধিনির্ভর নয়। কারণ স্বাধীন বিবাহে চিরসুখের গ্যারান্টি না থাকলেও অপরের দুষ্কর্মের ফল নিজে ভোগ করবার সম্ভাবনা নেই। আত্মীয়কুল দ্বারা অপাত্রে অর্পিতা নারীর দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার চেয়ে নিজের স্বাধীন কর্মফলে পাওয়া দুঃখ অনেক বেশী সহনীয় এবং যুক্তিগ্রাহ্য। চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে স্বাধীন প্রেমের প্রতিষ্ঠা নারী-শক্তির জাগরণেরই শুভ সূচনা। সে শক্তির বহুমুখী প্রকাশে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া আমাদের নিজ দুর্বলতারই লক্ষণ মাত্র। দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে হৃদয়ের কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি, তেমন অপরিচিত পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবার মধ্যে একটা অতীব অসুন্দর দিক আছে। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কেবলমাত্র একটা জৈবিক সম্পর্ক রূপে গণ্য করলে তবেই শুধু এ বিরাট অসুন্দরকে সমাজ জীবনে গ্রহণ করা সম্ভব। তৃতীয়ত, প্রেমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, কনে-দেখা, তত্ত্ব আদায় প্রভৃতি কুপ্রথা সমাজ থেকে অচিরে দূরীভূত হবে, আর ধর্মভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি গভীরতর কুসংস্কারের মূলেও আসবে প্রচন্ড আঘাত। নারী-পুরুষ সেদিন শুধু বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয়েই পরস্পরকে চিনবে।

বলা বাহুল্য, নারী জাগরণের পথে অনিবার্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার, যার ফলে একদিকে ভারতের ঘরে ঘরে নারীজাতির চোখের সামনে বৃহত্তর পৃথিবীর দরজা খুলে যাবে, আর অন্যদিকে স্বাধীন কর্মসাধনার জন্য প্রস্তুত হবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি। কিন্তু শিক্ষা এবং চৈতন্যের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। তার জন্য প্রয়োজন ব্যবহারিক জীবনে মননশীলতা। আজকাল অনেক সময় দেখা যায় যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তা তরুণীরা কয়েকজন যুবক বন্ধুর সঙ্গে মেলা-মেশা করে অবশেষে সবচেয়ে বিত্তশালী কিংবা ভাবী বিত্তশালী বন্ধুকেই অভিভাবক-দের কাছে উপস্থিত করেন অথবা নিজেই বিবাহ করেন। এ বিপ্লব কিন্তু সে বিপ্লব নয়। দ্বিতীয়ত, মধ্যবিত্ত ভারতীয় নারীকে সোনা-গয়নার মোহ পরিত্যাগ করতে হবে। ঘরে মজুত করা সোনা-গয়না দরিদ্র দেশের আর্থিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হতে পারে না। পরিবর্তে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে জমা রাখলে কিংবা অন্যভাবে আর্থিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক দরিদ্রতম দেশ হলেও এদেশে বহু সহস্র কোটি টাকা মূল্যের সোনা-গয়না ঘরে ঘরে মজুত পড়ে থেকে জাতীয় আর্থিক প্রগতিকে ব্যাহত করছে। ভারী এবং উজ্জ্বল ধাতু অঙ্গে ধারণ না করেও সৌন্দর্যচর্চা সম্ভব। পৃথিবীর কোন উন্নত দেশের নারীজাতিরই ভারতীয় নারীদের মত সোনা-গয়নার প্রতি এই প্রবল আসক্তি নেই। তৃতীয়ত, নারী প্রগতির আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নারীকে বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে। কারণ, সমাজের তথা বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা একই সূত্রে গ্রথিত। পরিশেষে ধর্মান্ধতা, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, খাদ্যা-খাদ্য, স্পর্শ, পূজাপার্বণ প্রভৃতি সংক্রান্ত এদেশের হাজার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। মনের এক কোণে বিভিন্ন কুসংস্কারকে যত্নে লালন করে আরেক কোণে স্বাধীনতার নীড় বাঁধা অসম্ভব। কালো এমনই জিনিস

যে সব আলো শোষণ করেও সে নিজের রং বজায় রাখে। অতএব কালোকে বর্জন না করলে আলোর রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন শক্তিময়ী নারীর নেতৃত্বে এদেশের দুরন্ত যৌবন গড়ে তুলবে এক উত্তাল সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সে বিপ্লবে একই সঙ্গে ধ্বংস হবে ধর্মভেদ, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, বহুবিবাহ, পরাধীন বিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা এবং অন্ধকার জগতের আরও যত সব দুর্মর কুসংস্কার। কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জালিমদের তৈরী সহস্র বাধানিষেধের লৌহ কারাগার চূর্ণ করে ভারতের নারী যেদিন সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করবেন, শক্তির কম্পন সেদিনই আরম্ভ হবে এদেশের আকাশে বাতাসে। শক্তির স্পন্দনে সেদিন শিহরণ জাগবে এ মুমূর্ষু জাতির অস্থি-মজ্জায়। তার গতিবেগে চঞ্চল হবে বিশ্ব।

যুবসংস্কৃতির স্বরূপ

আধুনিক বিশ্বে কোন দেশের যুবসংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যুবসংস্কৃতি সামগ্রিক জাতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই জন্মলাভ করে, যেমন জাতীয় সংস্কৃতি জন্মলাভ করে কোন দেশের বাস্তব আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশে। আবার কোন দেশের জাতীয় সংস্কৃতির উত্থান-পতন যেমন সেদেশের সামগ্রিক বাস্তব পরিস্থিতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে, তেমনি যুবসংস্কৃতিও সামগ্রিক জাতীয় সংস্কৃতি তথা বাস্তব পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে। বিশেষত, যুবসংস্কৃতির স্বরূপই এক অর্থে ভবিষ্যতের দিশারী, কারণ আগামী দিনের প্রগতি আজকের যুবসমাজের মধ্যেই সুপ্ত। উদ্দেশ্যহীনতা, নৈতিক আদর্শহীনতা, মদ্য এবং মাদকপ্রিয়তা, যৌন ব্যভিচার, এবং উন্মত্ত নৃত্যগীত প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে যে একধরনের যুবসংস্কৃতি গত কয়েক দশকে পাশ্চাত্ত্য জগতে গড়ে উঠেছে, তাকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি সহ অনেক পাশ্চাত্ত্য চিন্তাবিদ তাই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার লালবাতি আখ্যা দিয়েছেন। আবার সংবাদে প্রকাশ, এ ধরনের ভ্রষ্ট যুবসংস্কৃতি সোবিয়েত ইউনিয়নেও অনুপ্রবেশ করেছে, এবং একে প্রতিহত করবার জন্যে সোবিয়েত সরকার বিশেষ সচেষ্ট হয়ে পড়েছেন।

দুশ' বছরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ এদেশের আর্থিক কাঠামো তথা জাতীয় সংস্কৃতিকে বহুলাংশে বিকৃত ক'রে দিয়েছিল। এদেশের প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে ওপর থেকে চাপানো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এক ধরনের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ হয়েছিল। কিন্তু তা প্রধানত ধর্মভিত্তিক এবং সমাজের উপরতলায় সীমাবদ্ধ ছিল বলে আধুনিক অর্থে গণসংস্কৃতি কিংবা যুবসংস্কৃতির রূপ নিতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে বিকৃত সংস্কৃতির ধাক্কা আমরা আজও সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারিনি। কিন্তু জাতীয় সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুত্থানের সুযোগ নিশ্চয়ই আমাদের সামনে এসেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের যুবসংস্কৃতি সম্বন্ধে আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান ভারতে যুবসংস্কৃতির একটি প্রধান দিক হল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। এর মধ্যে অবশ্য ধর্মীয় প্রেরণা ততটা প্রবল নয়, যতটা পুজো-পার্বণকে কেন্দ্র করে এক ধরনের আনন্দ এবং উল্লাস। এ ধরনের যুবসংস্কৃতি আবার ভারতের সব রাজ্যেই কমবেশী থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গেই এর আবির্ভাব এবং প্রকোপ সবচেয়ে গভীর এবং ব্যাপক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদিও সাধারণত প্রগতিশীল এবং বামপন্থী বলে পরিচিত, তথাপি এ রাজ্যের যুবসংস্কৃতিতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব যত বেশী, তত আর কোন রাজ্যেই নয়। দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে প্রধানত এ ধরনের ধর্মীয় যুবসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে দুর্গাপুজো এবং কালীপুজো প্রধানত

সর্বজনীন রূপ নিয়েছে, এবং প্রধানত এই কারণেই যুবসমাজ এগুলোকে এক ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। চাঁদার বই ছেপে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা আদায় করা দিয়েই এই যুবসংস্কৃতির শুভ সূচনা হয়। মোটা রকম চাঁদা বাধ্যতামূলক। কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা পুজো করতে আগ্রহী বা ইচ্ছুক কি না তার উপর চাঁদা দেয়া নির্ভর করে না। এটা কার্যত এক ধরনের প্রোটেকশন মানি, অর্থাৎ বিনা অত্যাচারে বসবাস করবার বাসনায় সরকারি করের উপর অতিরিক্ত একটা বেসরকারি কর। একই এলাকায় সাধারণত অনেক পুজো হয় বলে, এবং স্থানীয় সব যুবগোষ্ঠীকেই তুষ্ট রাখবার প্রয়োজন আছে বলে, একই পুজোর জন্যে অনেক সময় স্থানীয় অধিবাসী-দের একাধিক জায়গায় চাঁদা দিতে হয়। তারপর শুরু হয় মণ্ডপ তৈরী, প্রতিমা প্রতিষ্ঠা এবং পুজো। পুজোর কদিন পাঁজিতে লেখা বিধান মত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবেই পালন করা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে চলে সারাদিন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত লাউড স্পিকারে বিপুল শব্দে নানা ধরনের নিম্নশ্রেণীর গান। কোন কোন ক্ষেত্রে বিসর্জনের দিন কিংবা তার দুয়েকদিন আগে-পরে অন্য কিছু গান-বাজনা, নাটক প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয় বটে। কিন্তু এধরনের যুবসংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে বিসর্জনকে কেন্দ্র করেই। উদ্যোক্তাদের আবশ্যিক মদ্যপান, প্রতিমার মিছিলে উন্মত্ত নৃত্য ও অন্যান্য ব্যভিচার, এসব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিসর্জন পর্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরস্বতী পুজোয় এসব ব্যভিচারের মাত্রা কিছু কম, আর পঁচিশ বৎসরের কম বয়সী যুবক-যুবতী এবং তরুণেরাই এতে অংশগ্রহণ করে বেশী। কিন্তু ধর্মীয়তা আর পুজোর ব্যাপকতায় সরস্বতী পুজো সম্ভবত দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোকে ছাড়িয়ে যায়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলে সরস্বতী পুজো আবশ্যিক ভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। অনেক সময়ে একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক পুজো হয়। তাছাড়া পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে, বাড়িতে বাড়িতে এবং যত্রতত্র সরস্বতী পুজো লেগেই থাকে।

বিভিন্ন দেবদেবীর যৌথ পুজোর মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এধরনের যুবসংস্কৃতির কতকগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, অন্যান্য দেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সাধারণত বয়স্ক নাগরিকেরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এদেশে, বিশেষত এ রাজ্যে, প্রধানত যুবসমাজই এতে অংশগ্রহণ করেন। আর তাছাড়া এব্যাপারে তাদের যতখানি যৌথ উদ্যম, উদ্দীপনা প্রকাশ পায়, অন্য কোন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে তার একাংশও লক্ষ্য করা যায় না। অতএব এই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ আমাদের যুবসংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, এধরনের যুবসংস্কৃতিতে যে শুধুমাত্র অশিক্ষিত যুবক-যুবতীরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন, তাই নয়। অথবা শুধুমাত্র সর্বহারা শ্রেণী নিজেদের দুঃখ দুর্দশাকে ভুলে থাকবার জন্যে ধর্মের আফিং খেয়ে এসব করে থাকেন, তাও নয়। শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক-যুবতীরাও এতে সমানভাবে যোগ দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরাই প্রাধান্য করেন। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গেও এধরনের যুবসংস্কৃতির কার্যত কোন সম্পর্ক নেই। সবরকম রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং দলের যুবক-যুবতীরাই এতে সমানভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী এবং কোন কোন বামপন্থী দলের রাজনৈতিক নেতাদেরও এসব অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে এবং এতে অংশ নিতে দেখা যায়। তবে কোন কোন মার্কস্‌বাদী দলের নেতারা অবশ্য এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকেন।

এধরনের ধর্মভিত্তিক যুবসংস্কৃতির নেতিবাচক দিকগুলোই প্রধান। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক মনোভাব গঠন ও প্রকাশের পরিপন্থী। এর মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে আনন্দ-উল্লাসের বাসনা প্রবলতর হলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে

কেন্দ্র করে গড়ে ওঠবার ফলে এর মধ্যে কুসংস্কারের মাত্রা অত্যন্ত প্রবল। ক্ষুদ্র চৈতন্যকে অতিক্রম করে বৃহত্তর বিশ্বজনীন চৈতন্যের সন্ধানে মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, যাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা বলা যেতে পারে। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু শাস্ত্র, পাদ্রী-পুরোহিত, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে আবদ্ধ ধর্ম বিজ্ঞান বিরোধী। এই ধর্ম মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে আমাদের এসব পুজো-পার্বণ সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ এবং সংঘাতের অন্যতম প্রধান কারণ। ভ্রান্ত চেতনার ফলশ্রুতি এধরনের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ অতএব কোনও সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞানসম্মত যুবসংস্কৃতির অঙ্গ হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, এরকম ধর্মীয় যুবসংস্কৃতিতে প্রচুর অর্থের অপব্যয় হয়। অর্থব্যয়ের প্রতি রাউন্ডে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে তবেই দ্রুত আর্থিক বিকাশ সম্ভব। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু পুজো-পার্বণে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, তা উৎপাদনের কোন কাজেই লাগে না। এই অর্থ প্রকৃতই জলে ফেলা হয়। তাছাড়া ভ্রান্ত চেতনা প্রসূত ধর্মীয় সংস্কৃতি যুবসমাজকে এই অর্থে বিপথগামী করে তোলে যে তারা দেশের কাঠামোগত আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে সম্যক্ উপলব্ধি না করে অবান্তর এবং প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি কুসংস্কারভিত্তিক এবং ক্ষতিকর সামাজিক কুপ্রথাগুলোর শক্তিবৃদ্ধি হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে ধর্মীয় যুবসংস্কৃতির মধ্যে সংস্কৃতির মাত্রা খুবই সামান্য, আর ব্যাভিচার এবং ভ্রষ্টাচারের মাত্রাই বেশী। যেদিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, এধরনের ধর্মাশ্রয়ী যুবসংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতি ভিন্ন অপর কোন আখ্যা দেয়া যায় না। অথচ কোন প্রগতিশীল যুবগোষ্ঠী কিংবা রাজনৈতিক দলকে আজ পর্যন্ত এই বিরাট অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়নি।

আরেক রকম যুবসংস্কৃতির নাম দেয়া যেতে পারে আনুষ্ঠানিক যুবসংস্কৃতি। অর্থাৎ কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে বা বিনা উপলক্ষ্যে বিচিত্রানুষ্ঠান, জলসা প্রভৃতির আয়োজন। পেশাদার গোষ্ঠীরা অনেক সময় আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে এসব অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হন। কিন্তু অনেক অপেশাদার যুবগোষ্ঠী, এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, সরকারি অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কর্মচারী সংগঠন প্রভৃতির মাধ্যমেও এধরনের সাময়িক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। এধরনের যুবসংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর কোন ধারাবাহিকতা বা স্থায়িত্ব নেই। একটি তাৎক্ষণিক অনুষ্ঠানই এর লক্ষ্য। আবার হয়ত পরের বৎসর আরেকটি অনুষ্ঠান। তাছাড়া এসব অনুষ্ঠানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বহুসংখ্যক যুবক-যুবতী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেন না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নামকরা শিল্পীদের বিপুল দক্ষিণা দিয়ে নিয়ে আসা হয়, আর তাঁরা যখন কণ্ঠসংগীত কিংবা যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন, তখন শতশত যুবক-যুবতী শ্রোতা এবং দর্শক হিসেবে তা উপভোগ করেন মাত্র। তাদের নিজেদের অংশগ্রহণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হাততালিতেই সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, এসব অনুষ্ঠানে অনেক সময় এত বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, যার কোন উৎপাদনমুখী ভূমিকা নেই, এবং উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশে যা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের অনুষ্ঠানে লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। অথচ অনেক সময়ই দেখা যায় যে সর্বহারাদের মঙ্গলের চিন্তায় উদ্বিগ্ন প্রগতিশীল ছাত্র ইউনিয়নরাই এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। এধরনের যুবসংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতি বললে অত্যুক্তি হবে না।

আজকাল ভারতবর্ষে অবশ্য যুব নাট্যগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে, এবং অন্যান্য রাজ্যেও কিছুটা। যদি পৌরাণিক

এবং ধর্মভিত্তিক নাটকের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া না হয়, তবে এধরনের যুবসংস্কৃতির মূল্য তুলনাক্রমে বেশী। কারণ এর মধ্যে দিয়ে শুধু শিল্পের বিকাশ হয় তাই নয়, প্রগতিশীল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে একাধারে উন্নত শিল্প সৃষ্টি এবং বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে জনমত গঠন সম্ভব হয়। কিন্তু এধরনের সাংস্কৃতিক প্রয়াস ক্ষুদ্র এবং সীমিত হতে বাধ্য। একটি উন্নতমানের সৃজনশীল এবং স্থায়ী নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলতে প্রচুর সময় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এতেও যুবসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন অবকাশ নেই। নাট্যবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অভ্যস্ত ক্ষুদ্র যুবগোষ্ঠীর পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব। যুবসাধারণ তথা জনসাধারণ নাট্যানুষ্ঠান থেকে মনোরঞ্জন লাভ করতে পারেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতির মত এ ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা শুধু দর্শকের।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে এদেশের যুবসংস্কৃতির সে বিশেষ ধারার, যা পাশ্চাত্ত্য যুবসংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এ ধারা অতীতের সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্তমান যুগের নয়া সাম্রাজ্যবাদেরই ফলশ্রুতি। আর এ বিজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতির মূল কারণ এই যে এসব দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য নয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিশেষত, প্রায় সমস্ত আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এবং প্রচার মাধ্যমগুলি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের কুক্ষিগত বলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তবে সৌভাগ্যবশত তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য সাংস্কৃতিক প্রভাব অনেক কম। সাধারণত উচ্চ মধ্যবিত্ত বিশেষত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় মানুষের, এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেই এদেশে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ শ্রেণীর যুবক-যুবতীরা জ্যাজ্ ও পপ্ মিউজিক এবং রক-এন্ড-রোল জাতীয় নৃত্য, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য যুবসংস্কৃতির কয়েকটি দিককেই ভারতীয় নৃত্য-গীতের চাইতে বেশী পছন্দ করেন। এদেশে এ ধরনের যুবসংস্কৃতির পক্ষে অনেক সময় এই যুক্তি দেখানো হয় যে নৃত্যগীত বিশ্বজনীন, তার আবেদন জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে। তাই যার যে ধরনের নৃত্যগীত মনঃপূত হয়, সে দেশকালের কথা চিন্তা না করে তাতেই অংশগ্রহণ করতে পারে। এ যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কিন্তু প্রশ্নটা জাতীয়তাবাদ বনাম বিশ্বজনীনতার নয়। ইতিহাসে কোন দেশে কোনদিন দেখা যায়নি যে মানুষ বিদেশী সংস্কৃতি আমদানী করে নিজের অস্তিত্ব এবং আত্মসত্তার স্ফুরণ এবং তার বাস্তব পরিবেশের সামগ্রিক সংস্কৃতিকে উন্নত এবং বিকশিত করতে পেরেছে। কারণ ব্যক্তি-মানুষের কৃষ্টি তার আত্ম-পরিচয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সে কৃষ্টির যৌথ বিকাশও দেশকালের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে সার্থক হতে পারে না। অতএব এধবনের আমদানী করা সংস্কৃতি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক ক্ষুদ্র পরগাছা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে মাত্র, যেমন থেকেছে এদেশের পাশ্চাত্ত্য প্রভাবাধীন যুবসংস্কৃতি। একে অপসংস্কৃতি না বললেও উপসংস্কৃতি বলতেই হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকৃত যুবসংস্কৃতি তবে কাকে বলব? আর এদেশের যুবসংস্কৃতিকে কিভাবে কলুষমুক্ত করে বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রগতিশীল যুবসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে? অতএব প্রথমেই প্রকৃত যুবসংস্কৃতির মৌলিক উপাদান-গুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যে ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে সত্যিকারের যুবসংস্কৃতি আখ্যা দেয়া যেতে পারে তার একটি প্রধান লক্ষণ হবে এই যে তাতে যুব-সাধারণ কেবলমাত্র, কিংবা প্রধানত, শ্রোতা অথবা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে না।

নিজেরাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। অতএব একথাও সহজেই বোঝা যায় যে ব্যক্তিগত নিপুণতা ভিত্তিক একক নৃত্যগীত যুবসংস্কৃতির উপকরণ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যুবক-যুবতীদের এই সর্বজনীন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে একটা স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা থাকবে। অর্থাৎ তা শুধু একদিনের কিংবা কয়েকদিনের কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হতে পারে না। বারো মাস প্রতিদিনই এই সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের রীতি এবং সুযোগ থাকতে হবে। তৃতীয়ত, এধরনের যুবসংস্কৃতির মধ্যে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। চতুর্থত, প্রকৃত যুবসংস্কৃতির রূপ এবং আঙ্গিক এমন হবে যার মধ্যে থাকবে একটা সাবলীল গতিশীলতা আর যৌবনের জৈবশক্তির অফুরন্ত প্রকাশ। এ সত্যও সহজেই প্রতীয়মান হবে যে কোন কঠিন অনুশাসন কিংবা উচ্চ ব্যাকরণে বাঁধা নাচ গানের ভেতর দিয়ে এধরনের স্বতঃস্ফূর্ত যুবশক্তির প্রকাশ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সত্যিকারের যুবসংস্কৃতির প্রকৃতি হবে সরল এবং স্বচ্ছন্দগতি। পরিশেষে উল্লেখ্য, পশ্চাৎমুখী, প্রাচীনপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব এবং বিষয়বস্তু পরিহার করে যুবসংস্কৃতিকে হতে হবে বিজ্ঞানধর্মী, মুক্তিধর্মী, বাস্তবতা ভিত্তিক, প্রগতিশীল এবং ভবিষ্যৎমুখী।

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, প্রকৃত যুবসংস্কৃতির প্রধান প্রধান উপকরণগুলি এদেশের বর্তমান যুবসংস্কৃতিতে নেই বললেই হয়। যুবসংস্কৃতির যেসব বিভিন্ন দিক নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে, তার কোনটিতেই এসব উপাদান উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। এই অভাবের কয়েকটি বিশেষ কুফল আগেই আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে আরও কিছু কুফলের উল্লেখ করা যেতে পারে। একথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে এ দেশের বাস্তব সামাজিক পরিবেশে প্রকৃত যুবসংস্কৃতির অস্তিত্ব নেই বলেই যুবসমাজ ধর্মীয় অপসংস্কৃতি, নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিজাতীয় উপসংস্কৃতি, এবং অন্যান্য অসম্পূর্ণ ও অনুপযুক্ত সংস্কৃতির শিকার হয়েছে। আর স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দভাবে যুবক-যুবতীদের মেলামেশার সুযোগের অভাববশত আরও কতকগুলি কলুষ আমাদের সমাজের বুকে বাসা বেঁধেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ ধরনের স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত মেলামেশার সুযোগ নেই বলেই জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি কাঠামোগত সামাজিক বাধাবন্ধ এবং সংঘাত প্রায় স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। কারণ সহজ মেলামেশার সুযোগের অভাব থেকে আসে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব, আর সে দূরত্ব জন্ম দেয় দ্বেষ ও হিংসার। উপরন্তু, বৈজ্ঞানিক যুবসংস্কৃতির মাধ্যমে স্বাধীন মেলামেশার স্থায়ী সুযোগের অভাবে যুবক-যুবতীরা বিবাহের জন্য পিতামাতা বা অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, আর অবশ্যম্ভাবী রূপেই জাতিভেদ, পণপ্রথা প্রভৃতির শিকার হতে বাধ্য হন। আর এসব কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে বিবাহ হয় বলে আমাদের এ ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আরও অবক্ষয়ের পথে অনিবার্য ভাবেই অগ্রসর হয়। স্বাধীন বিবাহ থেকেও অবশ্য মানুষের জীবনে দুঃখ আসতে পারে। কিন্তু সে দুঃখের নৈতিক দায়িত্ব তার নিজের। অপরের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া দুঃখের বোঝা নিজের অর্জিত দুঃখের চেয়ে অনেক বেশী গুরুভার এবং অসহনীয়। আর স্বাধীন বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক কলুষ আর কুপ্রথাগুলির শ্রীবৃদ্ধি না হয়ে অবলুপ্ত হতে বাধ্য।

এদেশে প্রকৃত যুবসংস্কৃতির অভাব এবং তার সামাজিক কুফলগুলোর জন্যে অবশ্য যুবসমাজকে মূলত দায়ী করা চলে না। যুবসমাজ শক্তির আধার, আনন্দের পূজারী। সমাজ এবং রাষ্ট্র যদি উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কের মত অসংখ্য বাধাবন্ধ সৃষ্টি করে যুবসমাজের শক্তি আর আনন্দধারাকে দিকে দিকে আবদ্ধ করে দেয়, তবে তা ক্ষিপ্র গতিময়তা হারিয়ে ফেলে স্রোতহীন, পঙ্কিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরিণত হতে বাধ্য। অপর পক্ষে সমাজ

আর রাষ্ট্র যদি তার প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল অনুশাসনগুলি শিথিল করে শক্তি আর আনন্দের দরজা দিকে দিকে অবারিত করে দেয়, তবে যুবসমাজ অপার উৎসাহে নিত্য নব সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠবে। কুসংস্কার আর ভেদাভেদের বাঁধ ভেঙে নতুন জলের বান আসবে, আর সে জলে অঙ্কুরিত হবে নবতর সমাজ ব্যবস্থার বীজ। এদেশের নিরানন্দ, বিষাদঘন যুবক-যুবতীদের জীবনও সে সুপ্রভাতে হয়ে উঠবে সৃষ্টিময় আর আনন্দমুখর।

মুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃত যুবসংস্কৃতির বাস্তব রূপ এদেশে কি হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার সুযোগ এখানে নেই। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে একমাত্র বলিষ্ঠ যুবনৃত্যই এ ধরনের যুবসংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। নৃত্য মানুষের জীবনে মহাবিশ্বের স্পন্দনের প্রতিফলন। গ্রহতারকার ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে নৃত্য, রাত্রির পরে দিন, আবার দিনের পরে রাত্রির অফুরন্ত নৃত্য, জন্মমৃত্যুর চিরন্তন নৃত্য, আর বিশ্বপ্রকৃতির সন্তান মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য একই স্পন্দনে বাঁধা। বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, আর বীজ থেকে অঙ্কুরের যে অন্তহীন প্রাকৃতিক নৃত্য চলছে, তারই আনন্দময় প্রতিফলন মানুষের নৃত্যে। গঙ্গা যমুনার জোয়ার-ভাঁটার নৃত্য মহাবিশ্বের একই স্পন্দনের প্রতিফলন। তাই মানব-শিশু দাঁড়াতে শিখবার আগেই অফুরন্ত আনন্দে নৃত্যরত হয়, কারণ সে প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি। তাই প্রকৃতির আনন্দোৎসবে সাড়া দিয়ে মাদল বাজিয়ে নাচতে আরম্ভ করে। যৌবনে মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যের প্রয়োজন আরও অনেক বেশী, কারণ মানবজীবনের শক্তি ও ছন্দের পূর্ণ বিকাশ হয় যৌবনেই। এই কারণেই স্বাভাবিক যুব-সংস্কৃতির মধ্যে নৃত্যের মৌলিক প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

উপরে আলোচিত প্রকৃত যুবসংস্কৃতির সংজ্ঞায় যেসব উপাদানগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলিই যুবনৃত্যের মাধ্যমে সার্থক হয়ে উঠতে পারে। এই নৃত্য ধর্মীয় কিংবা আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতির গণ্ডীকে অতিক্রম করে সহজেই সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, কিংবা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের যুবক-যুবতীরা কাজের শেষে বা ছুটির ফাঁকে বারোমাস প্রতিদিনই আনন্দমুখর যুব-নৃত্যে মেতে উঠতে পারেন। এর জন্যে কোন দীর্ঘ প্রস্তুতি, অনুশীলন অথবা ব্যয়বহুল বন্দোবস্তের প্রয়োজন হবে না। যুবক-যুবতীরা সহজে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি আসতে পারবেন, এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি ভুলে গিয়ে পরস্পরকে শুধু মানুষ হিসেবেই চিনতে এবং জানতে শিখবেন। ফলে বর্তমান সমাজের অনেক কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং বাধাবন্ধ দূর হয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হবে। এদেশের যুব-সমাজের বিবর্ণ বিষণ্ণ জীবনে আসবে কিছুটা আনন্দের স্বাদ। যুবশক্তির এই সৌন্দর্যময় বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিতে সৃষ্টিধর্মী কর্মপ্রেরণার উৎসমুখ খুলে যাবারও সম্ভাবনা থাকবে। এই কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে, তা সে দেশ ধনতান্ত্রিকই হোক বা সমাজ-তান্ত্রিকই হোক, যুবসংস্কৃতির মধ্যে যুবনৃত্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষ সহ কয়েকটি এশীয় দেশে সাধারণ যুবসংস্কৃতির মধ্যে যুবনৃত্যের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই।

এখন প্রশ্ন হল, এদেশের যুবসংস্কৃতির প্রধান আঙ্গিক হিসেবে কি ধরনের যুবনৃত্য সম্ভব অথবা বাঞ্ছনীয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখা ভালো যে কোন বিজাতীয় যুবসংস্কৃতি থেকে আমদানী করা কোন বিশেষ নৃত্যভঙ্গী এদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত করা সম্ভব নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে কোন দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎসমুখ থেকেই সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ যুবসংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে। এই উদ্দেশ্যে অনেক সময়ই জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক

অথবা আংশিক পরিশীলন এবং পরিবর্ধনের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সে ঐতিহ্যকে সরাসরি অস্বীকার করে কোন স্থায়ী যুবসংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ পশ্চিম থেকে আমদানী করা যুবসংস্কৃতির যে ধারাটির কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে সর্বজনীন যুবনৃত্য এদেশে গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত ইউনিয়ন কিংবা ধনতান্ত্রিক আমেরিকা, যে কোন দেশই হোক, সেখানকার যুবনৃত্যে নারী-পুরুষ পরস্পরকে স্পর্শ করে অথবা পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে নৃত্য করে। এর একটা বিশেষ জৈব প্রয়োজন আছে। যুবকযুবতীদের অতি স্বাভাবিক যৌন আবেগ এর মধ্যে দিয়ে ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়ে একটা সাংস্কৃতিক রূপ ধারণ করে, আর যৌন চেতনার এই সাংস্কৃতিক উত্তরণ মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ এবং কর্ম-প্রেরণার সহায়ক। অতএব এদেশের ঐতিহ্য থেকে যে ধরনের নৃত্যকেই আমরা গড়ে তুলি না কেন, তা থেকে স্ত্রী-পুরুষের সহনৃত্যকে বাদ দেয়া চলবে না। বরঞ্চ এই সহনৃত্যকে যুবনৃত্যের অপরিহার্য আঙ্গিক রূপে গণ্য করতে হবে। আপাত শ্রবণে এ বক্তব্য অনেকের কাছে অতিবিপ্লবী মনে হলেও এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিংবা অসম্ভব কিছুই নেই। এদেশে সহশিক্ষা প্রচলনের আদিপর্বে এমনি ভাবে অনেক প্রাচীনপন্থী মানুষই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পঁচিশ বৎসর আগেও ক্লাশে শিক্ষক উপস্থিত না থাকলে ছাত্রীদের সহশিক্ষামূলক ক্লাশে প্রবেশ করবার অনুমতি মিলত না। কিন্তু আজ আর কেউ সহশিক্ষাকে কিংবা পরিণত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের অবাধ মেলামেশাকে ভীতি বা সন্দেহের চোখে দেখেন না। মহিলাদের অফিসে-কারখানায় কাজ করা বা ট্রাম-বাসে যাতায়াত করা সম্বন্ধেও অনুরূপ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। নাটকে আগে স্ত্রীচরিত্রে পুরুষেরা অভিনয় করতেন। আজ স্ত্রীপুরুষে ঘনিষ্ঠভাবে প্রেমের অভিনয় করাকে আমরা যে শুধু অস্বাভাবিক বা ব্যভিচার মনে করি না তাই নয়। আজকাল কোন পুরুষ শাড়ি পরে, স্নো-পাউডার, কাজল-আলতা মেখে, শাঁখা-সিঁদুর পরে অভিনয় করতে নামলে তাকে কুরুচির পরিচয় বলেই গণ্য করা হবে। তেমনিভাবে প্রথমে যারা যুবকযুবতীদের নিত্যকার সহনৃত্যের দৃশ্যে আতঙ্কিত হবেন কালক্রমে তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরেরা একেই সহজ ও স্বাভাবিক বলে মেনে নেবেন। আর যাদের যৌবন অতীত হয়েছে তাদের এ আত্মজিজ্ঞাসারও প্রয়োজন আছে যে যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির এই নতুন সুযোগ ও পরিকল্পনা দেখে তাদের মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে, তার মধ্যে কতখানি যৌবনের মঙ্গলকামনা আর কতখানি বার্ধক্যের ঈর্ষাকাতরতা। এ জগতে যা কিছু সহজ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত, তাই সুন্দর।

এদিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় লোকনৃত্যের কয়েকটি শাখাকে যুবনৃত্যের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে বাদ দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ পাঞ্জাবের ভাংড়া নৃত্য এবং গুজরাটের গরবা নৃত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ প্রথমটিতে একমাত্র পুরুষেরা অংশগ্রহণ করেন, আর দ্বিতীয়টিতে একমাত্র মহিলারা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এ ধরনের পৃথকীকরণের ফলে ধর্ম রক্ষিত হচ্ছে কিনা জানি না, কিন্তু ব্রহ্মচর্য যে রক্ষিত হচ্ছে না তা জোর দিয়েই বলা যায়। তা না হলে এই ব্রহ্মচর্যের আদর্শে বিশ্বাসী দেশে জনসংখ্যার এই বিপুলতা আর দ্রুত বৃদ্ধিই বা কেন হবে, আর প্রতি শহরে, গ্রামে-গঞ্জে সুসংগঠিত গণিকাবৃত্তি এত সামাজিক স্বীকৃতিই বা লাভ করবে কেন? প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পৃথকীকরণের মূলে রয়েছে পুরুষ শাসিত সমাজে স্ত্রীজাতির পরাধীনতা, আর প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার। কিন্তু কুসংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে ভাংড়া জাতীয় লোকনৃত্যকে সহনৃত্যে রূপান্তরিত এবং আরও পরি-মার্জিত এবং পরিশীলিত করতে পারলে এর মধ্যে হয়ত নয়া যুবসংস্কৃতির অন্যতম

উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

স্বগীয় গুরুসদয় দত্ত তরুণদের বিকাশের পক্ষে নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নৃত্যকে তাই তিনি ব্রতচারী আন্দোলনের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা ছিল নিঃসন্দেহে আধুনিক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। কিন্তু ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রবর্তিত নৃত্যগীতের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়বস্তু এবং কঠোর অনুশাসন আছে বলে তা কিছু পরিমাণে যুগোপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষত, কিশোরদের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা আজও কিছুটা থাকলেও, যুবনৃত্যের দিক থেকে আজ এই আন্দোলন আর বিশেষ উপযোগী নয়। কিন্তু গুরুসদয় দত্তের চিন্তাধারায় একটা অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা ছিল, যা থেকে ভবিষ্যতের যুবনৃত্য এবং যুবসংস্কৃতি নিঃসন্দেহে প্রেরণা লাভ করতে পারে।

এদেশের আদিবাসীদের মধ্যে গণনৃত্যের ঐতিহ্য ব্যাপক। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলিতে আবার মুখোশ এবং অন্যান্য বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আভরণের প্রয়োজন হয় বলে সর্বজনীন যুবনৃত্যের পক্ষে অনুপযোগী। উদাহরণস্বরূপ পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের কথা বলা যেতে পারে। ক্লাশের শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সহজভাবে এ নৃত্যে মেতে ওঠা সম্ভব নয়। তার জন্যে আভরণহীনতা, সরলতা এবং আধুনিকতার প্রয়োজন। তবে সাঁওতালদের অনেক গণনৃত্য যুবনৃত্যের পক্ষে উপযোগী। অন্তত তার থেকে এদেশে আধুনিক যুবনৃত্যের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সহনৃত্য ভিত্তিক সরল, নিরাভরণ গণনৃত্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। দার্জিলিং, সিকিম, প্রতিবেশী দেশ নেপাল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে এ ধরনের সাধারণ, সুন্দর গণনৃত্য সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি এদেশে আধুনিক যুবনৃত্যের প্রধান উৎস হতে পারে। অর্থাৎ এদেশের গণনৃত্যের বিভিন্ন ধারার বিচার-বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে যুবনৃত্যের উপযোগী ধারাগুলিকে বেছে নিতে হবে। আর সেগুলোর পরিশীলন, পরিমার্জন এবং আধুনিকীকরণ করে এমন এক যুবনাট্যের ধারা গড়ে তুলতে হবে যাতে এদেশের যুবক-যুবতীরা যে কোন দিন, যে কোন সময়, অবসর বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সরল, সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত সহনৃত্যে মেতে উঠতে পারেন।

আধুনিক প্রগতিশীল যুবনৃত্য এবং যুবসংস্কৃতির অন্যান্য আঙ্গিকের বাঞ্ছিত স্বরূপ এবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণই নির্ণয় করতে সক্ষম। কিন্তু যুবনৃত্য ভিত্তিক এধরনের নয়া যুবসংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আগামী দিনের এই যুবসংস্কৃতি শুধু যুবশক্তির বিকাশের পথই উন্মুক্ত করবে না। শুধু বহুসংখ্যক অন্ধ সামাজিক কুসংস্কার, বাধাবন্ধ এবং সংঘাতের মূলোচ্ছেদই করবে না। এক নয়া গণসংস্কৃতিরও ভিত্তি রচনা করবে। বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে দেশে এবং বিদেশে যে জিনিসটি পরিচিত, তা শুধু তথাকথিত উচ্চ জাতিভুক্ত মুষ্টিমেয় অনুশীলনপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নীচের তলার মানুষের গণসংস্কৃতির সঙ্গে এর কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। আর তার ফলে এই উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির মধ্যে নেই কোন শক্তির প্রকাশ, কোন প্রাণের সঞ্চার। উপরে বর্ণিত নয়া যুবসংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এই উন্মার্গতা এবং শক্তিহীনতা দূর করবে। সমাজের নীচের তলার মানুষের সংস্কৃতিকে সর্বজনীন রূপ দিয়ে এই যুবসংস্কৃতি নতুন বলিষ্ঠ গণসংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করবে। যুবশক্তির বিপুল স্ফুরণে এদেশের অস্থিমজ্জায় শিহরণ জাগিয়ে বিরাট প্রাণের সঞ্চার হবে। আর সে স্পন্দিত গণশক্তি অমোঘ প্রগতির পথে অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে যে যুবসংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির যেমন একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি আবার জাতীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে। অতএব দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা সম্পূর্ণ বিপ্লব করা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা মনে করলেও ভুল হবে যে একমাত্র কাঠামো পরিবর্তন করেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব আনা সম্ভব, এবং অন্য কোনভাবে সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব কাঠামো এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্বন্ধটা পারস্পরিক। বাস্তব কাঠামো যেমন একদিকে সংস্কৃতির গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে, তেমনি আবার পুঞ্জীভূত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কাঠামোর পরিবর্তনকে প্রতিহত কিংবা ত্বরান্বিত করে। অনেক সময় দেখা যায় যে এ ধরনের পুঞ্জীভূত সাংস্কৃতিক পরম্পরা এক স্বাধীন সততা নিয়ে বিরাজ করে, এবং প্রবল ও প্রত্যক্ষ আঘাত ছাড়া টলতে চায় না। অতএব কাঠামোগত পরিবর্তনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি সে পরিবর্তনের পূর্বে এবং পরে অপসংস্কৃতির ভিত্তিমূলে প্রবল আঘাত হানবারও প্রয়োজন আছে। এদেশের সহস্র বৎসরের পরিবর্তনহীন শীলীভূত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন তাই অপরিহার্য। আর সেই বলিষ্ঠ গণঅভ্যুত্থানের প্রধান হাতিয়ার হবে উপরে বর্ণিত সর্বজনীন নয়া যুবসংস্কৃতি।

ভারতে ইতিহাস চেতনা

ইতিহাস স্বয়ম্ভূ নয়, দেবদত্তও নয়। মানুষ যৌথ প্রচেষ্টায় ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সৃষ্টিযজ্ঞে সব মানবগোষ্ঠীর ভূমিকা সমান হয় না। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক জাতি স্বীয় শক্তি ও গতিশীলতায় ইতিহাসকে বীর্যবান করে তুলেছে, আবার অনেকে তমোগুণকে আশ্রয় করে মন্থর কায়োমনে ইতিহাস স্রষ্টাদের বশ্যতা স্বীকার করেছে। এই গতিশীলতা আর মন্থরতার প্রধান কারণ ইতিহাস চেতনার তারতম্য। ইতিহাস চেতনা কোন্ জাতির আত্ম-চেতনারই নামান্তর। নিজ অতীত এবং বর্তমান সম্বন্ধে সচেতনতাই জাতি ও সমাজকে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রেরণা যোগায়, দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্জগতে নূতন ইতিহাস চেতনা অতএব ইতিহাস সৃষ্টির মূল উপাদান।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে, এমনকি আধুনিক যুগেও অন্তত উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত, আমাদের ইতিহাস চেতনা ছিল অত্যন্ত গভীর। এই ইতিহাসমন্যতার অভাবের প্রথম নজির এই যে, অতি আধুনিক যুগ বাদে অন্য কোন যুগে কোন ভারতীয় ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেননি। ইতিহাস পুরাণ বা ইতিহাস শাস্ত্র নামে যে জিনিস আমাদের পণ্ডিতেরা রচনা করেছিলেন, তা শুধু রূপকথা, ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণ, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বল্‌গাহীন কল্পনাশক্তির আদিম অভিব্যক্তি মাত্র। মধ্যযুগে কল্‌হানের 'রাজতরংগিনী' কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিহাস বলে পরিচিত, কিন্তু এটিও ইতিহাস হিসেবে বিশুদ্ধতা দাবী করতে পারে না। ইতিহাস রচনায় ভারতীয়দের অবদান একমাত্র মাটি খুঁড়েই যেটুকু পাওয়া গেছে—প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, নগর, ধর্মস্থান, রাজপ্রাসাদ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। সেই মাটি খোঁড়াও প্রথমে ইংরেজরাই আরম্ভ করেছিলেন। ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস যেটুকু পাওয়া যায়, তার সবই বিদেশী পর্যটকদের রচিত—প্রাচীন যুগে প্রধানত গ্রীক ও চীন পর্যটকদের, আর মধ্যযুগে প্রধানত আরব ও ইউরোপীয় পর্যটকদের এই বিবরণগুলোই মৌর্যযুগ থেকে মুঘল যুগের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ইংরেজ যুগের প্রথমার্ধে ইংরেজরাই এদেশের ইতিহাস লিখেছেন, শেষার্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারার প্রভাবে ভারতীয়েরাও লিখেছেন।

উপরন্তু আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান, কাল কিংবা লেখকের নামের কোন উল্লেখ নেই। মনু, চার্বাক, ব্যাস, বাল্মীকি, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, শুক্র প্রভৃতি নামে বহু ব্যক্তি একই স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র কিংবা কাব্যগ্রন্থে নিজ নিজ অবদান রেখে গেছেন, এবং পরবর্তী লেখক উত্তরসাধকের রচনায় যোগ, বিয়োগ বা পরিবর্তন সাধন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। ফলে মূল রচনাকার এবং তাঁর সমকালকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য, আর একই গ্রন্থের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির মধ্যে আকৃতি ও মূল বক্তব্যে

কদাচিৎ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোন বিশেষ গ্রন্থ যে ইতিহাসের কোন নির্দিষ্ট সময়ে, কোন খণ্ডকালের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপ্রসূত ফল, এ ধারণা ভারতীয় পণ্ডিতসমাজের ছিল না। তাঁরা ছিলেন ইতিহাসের পরিধির বাইরে এক সনাতন এবং অপরিবর্তনশীল জ্ঞানের ভাণ্ডার সৃষ্টির প্রয়াসী।

আমাদের মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করলে সমাজের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজের কোন সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজনীতি, সমাজ-নীতি, দণ্ডনীতি, প্রজাধর্ম, বর্ণধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারত থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগীয় 'শুক্রনীতিসার' পর্যন্ত চিন্তাজগতে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। অনেক বহিরাক্রমণ, বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়ার সাক্ষ্য বহন করে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে রাজনীতি-চিন্তা, অন্তত নূতন দিগদর্শনের প্রয়াস পাবে, এ কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতে পাই, মহাভারতের শান্তিপর্ব এবং 'শুক্রনীতিসার'-এর মধ্যে-কার অন্তত দু হাজার বছরের ব্যবধান তথাকথিত শুক্রাচার্যের মনে বিশেষ রেখাপাত করেনি। যদিও 'শুক্রনীতিসার'-এ রাজনীতি বিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, তথাপি মহাভারতের শান্তিপর্ব, মনুসংহিতা, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং 'তন্ত্রনীতিসার'-এ মূলত এক এবং অবিভাজ্য রাজনীতিতত্ত্ব বর্তমান।

ঐতিহাসিক কালের হিসাবের সুষ্ঠু নিয়মের অভাবও ভারতীয় সমাজের ইতি-হাসমন্যতার অভাবেরই পরিচায়ক। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থে অবশ্য সময়ের বিভিন্ন হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু এসব হিসাব একদিকে হিন্দু দর্শনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত এবং যুগ, কল্প, মন্বন্তর, মহামন্বন্তর প্রভৃতি গণনার, এমন কি কল্পনার অসাধ্য সময়ে বিভক্ত। এ হিসাব সৃষ্টিতত্ত্বের, ইতিহাসের নয়। এর কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে ব্যবহারিক ধর্মীয় প্রয়োজনে দণ্ড, পল, মুহূর্ত, নিমেষ প্রভৃতি সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ করা হয়েছে। এরও কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। এ দুয়ের মাঝখানে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজনে সৌর এবং চান্দ্র বৎসর মাস ও দিন হিসাবের রীতি প্রচলিত ছিল সত্যি, কিন্তু কোন বৎসর গণনা বা ক্যালেণ্ডারের রীতি প্রাচীন ভারতে ছিল না। বহিরাগত কুশানেরা শকাব্দের প্রবর্তন করেছিল, পরবর্তীকালে বিদেশী প্রভাবে বিক্রম সম্বৎ, বংগাব্দ প্রভৃতি চালু করবার চেষ্টা হয়। কিন্তু এর কোনটিই সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেনি এবং সমাজের ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ প্রচলিত হয়নি। এমন কি প্রাচীন যুগে অন্যান্য দেশের মত সূর্য-ঘড়ি কিংবা বালির ঘড়ির প্রচলনও এদেশে ছিল না—সূর্যঘড়ি সম্ভবত আরবরা এদেশে প্রথম আনে। সময়ের স্রোত এদেশে অলক্ষিতে বয়ে চলেছে নিরন্তর। দিন, মাস, বৎসর সব ঋতু পরিবর্তনের মতই মানুষের হিসাবের খাতায় কোন চিহ্ন না রেখে মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে নিঃশব্দে। আমাদের তথাকথিত প্রাচীন ইতিহাসকারেরা তাই কখনো দশ বৎসর এবং দশ সহস্র বৎসরের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাননি।

ভারতের আমজনতার ইতিহাস-বৈরাগ্যের সবচেয়ে বড় নিদর্শন সম্ভবত এই যে, বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে কিংবা অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে তারা কখনো সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ কিংবা অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেননি। যে কোন বিদেশী শত্রু তাই এদেশের জনসমর্থনহীন দুর্বল ও বিভক্ত ক্ষত্রিয়দের সহজে পরাস্ত করে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, এদেশের রাজার সৈন্যদের সঙ্গে যখন বিদেশী কিংবা অন্য রাজার সৈন্যদের যুদ্ধ হত, তখন অনতিদূরেই কৃষকেরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্লিপ্তভাবে জমি চাষ করত। আর রাষ্ট্রবিপ্লব বলতে এদেশে চিরদিন বুঝিয়েছে ক্ষত্রিয়দের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজবংশের উত্থান পতন। কোন গণ-আন্দোলন

অথবা অভ্যুত্থান, কোন শ্রেণী সংগ্রাম, এমন কি রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোন গণষড়যন্ত্রের নজিরও ইতিহাসে নেই। যা কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে, সবই ওপর থেকে সৃষ্ট এবং ওপরতলায় সীমাবদ্ধ। অগভীর তরঙ্গসংঘাতের নীচে অতল গণসমুদ্র থেকেছে মৌন, স্থির, অচঞ্চল। বহু শতাব্দীর গণস্থবিরতার এত বড় উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও নেই।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে আগ্রাসী মধ্য ও পশ্চিম এশীয় শক্তির এবং আধুনিক যুগে জলপথে আগত আগ্রাসী পাশ্চাত্ত্য শক্তির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পীড়নের প্রত্যুত্তর ভারতবর্ষ বারবার ইতিহাসের মধ্যে সন্ধান না করে প্রায় এক আধিভৌতিক তরিকায় দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন যুগে বহিরাগত শক্তির প্রভাবের প্রত্যুত্তর এদেশ দিয়েছে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মাধ্যমে। মধ্যযুগে আগ্রাসী আরব সভ্যতার প্রত্যুত্তরে ভারতে জন্ম নেয় ভক্তি আন্দোলন। আর আগ্রাসী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উত্তরে সৃষ্টি হয় ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশন। যেন ইতিহাসের চ্যালেঞ্জের সামনে এসে এদেশ ইতিহাসের চোখের দিকে তাকাতে শেখেনি বলে বার বার তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের বিপদকে ভুলবার চেষ্টা করেছে। এ চেষ্টায় দূরদৃষ্টি থাকতে পারে, কিন্তু শক্তির প্রকাশ নেই।

সমকালীন অন্যান্য সভ্যতায় কিন্তু এ ইতিহাসবিমুখতা দেখা যায় না। গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যে ইতিহাস সৃষ্টি এবং প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ রচনা, দুয়েরই বিপুল প্রচেষ্টা ছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইতিহাস রচনা ছাড়াও গণ-আন্দোলনের এবং গণ-অভ্যুত্থানের অনেক নজির আছে। প্রাচীন মিশরেও ইতিহাস চেতনা এবং ইতিহাসকে ধরে রাখবার চেষ্টা, দুইই প্রবল ছিল। মধ্যযুগীয় আরব সভ্যতায় ইতিহাস চেতনার ঘটেছিল এক অভূতপূর্ব বিকাশ। কর্মে, চিন্তায় এবং রচনায় আরবরাই ছিলেন মধ্যযুগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইতিহাস স্রষ্টা। বিশেষ করে প্রতিবেশী চীনের কথাই ধরা যাক। অতি প্রাচীনকালে চীনে 'ইতিহাস-গ্রন্থ' (Book of Histories) রচিত হয়, এবং বিভিন্ন সম্রাট, সাম্রাজ্য এবং চিন্তাগোষ্ঠীর আয়ুষ্কালের সঠিক হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণ মানুষ বিশেষত কৃষক সমাজ, রাজনীতির ভাঙাগড়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীনের প্রায় সব বড় বড় সাম্রাজ্যের পতনই হয় গণ-অভ্যুত্থান, বিশেষ করে কৃষক অভ্যুত্থানের ফলে। মাও-সে-তুং তাঁর বিভিন্ন রচনায় লিখেছেন যে, চীনের ইতিহাসের শত শত কৃষি অভ্যুত্থানের বিপ্লবী ঐতিহ্যকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এবং নবরূপে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর ঐতিহাসিক দায়িত্ব। চীনের মানুষের এই ইতিহাস চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই রয়েছে, কারণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রধানত চীনা পর্যটকদের রচিত।

॥ ২ ॥

ভারতে এই ইতিহাসমনস্কতার অভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। অনেক ভারতীয় এবং বিদেশী পণ্ডিতের মতে মায়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদান্তিক চিন্তা-ধারাই ইতিহাসবিমুখতার প্রধান কারণ। ইহজগৎ অসার ও মায়াময়, জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মোক্ষ লাভ করে ঈশ্বরে বিলীন হওয়াই জীবাত্মার উদ্দেশ্য, এই পৃথিবীবিমুখ জীবনদর্শনের ভিত্তিতে ইতিহাসচিন্তা গড়ে উঠতে পারে না। এই চিন্তাধারায় ইতিহাস ও রাজনীতির চেয়ে রহস্যবাদ ও আধিবিদ্যক দর্শনের, ইহলোকের চেয়ে পরলোকের,

কালের চেয়ে মহাকালের প্রাধান্য বেশী। অতএব এ ধর্মপ্রাণ দেশে ইতিহাস চেতনার দার্শনিক বাতাবরণ কখনো গড়ে ওঠেনি, সংক্ষেপে এই হল এ মতের প্রবক্তাদের প্রতিপাদ্য। কিন্তু এ মত উত্তমাংশে সমস্যার আংশিক এবং অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মাত্র। মায়াবাদ বৈদিক যুগের শেষভাগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণদের পরগাছাসুলভ শ্রেণীচরিত্র এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের রাজনৈতিক ও শোষণ ক্ষমতা বজায় রাখবার একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাস্তব ইতিহাসে ক্ষত্রিয় শ্রেণী ক্ষমতার লড়াই অথবা শোষণ ভুলে গিয়েছিল, কিংবা বৈশ্যশ্রেণী মুনাফাবাজী ভুলে গিয়ে পরলোকচিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েছিল, এমন কোন নজির নেই। বস্তুত, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা ও নানা কুসংস্কারে বাঁধা প্রাচীন হিন্দু সমাজের ব্যবহারিক জীবনে অদ্বৈত দর্শনের কোন স্থান ছিল না। অল্পসংখ্যক সংসারত্যাগী সাধকের মিস্টিসিজমেই অদ্বৈতবাদের প্রকাশ ঘটেছিল। তথাপি অদ্বৈতের এক অপার্থিব এবং মায়াবাদী ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণদের সাহায্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশ্রেণী যে শোষিত শ্রেণীগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে আফিং-এর মত ব্যবহার করেনি, সে কথা বলা চলে না।

এই উত্তরও শোনা যায় যে হিন্দুধর্ম প্রচারধর্মী নয় এবং কখনো ছিল না বলেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েনি, আর সে কারণেই বহির্জগতের বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছিল। খৃষ্টধর্ম, ইসলাম, এমন কি বৌদ্ধধর্মও প্রচারধর্মী বলে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ফলে ইতিহাস চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যার মত এই উত্তরেও আংশিক সত্যতা থাকতে পারে বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু মূল সমস্যার তথাপি সমাধান হয় না। দেশের অভ্যন্তরে অন্যভাবে ইতিহাস চেতনা জন্মাল না কেন, আর হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মের মত প্রচারধর্মীই বা হল না কেন?

একথাও কখনো শোনা যায় যে, হিন্দুদের সৃষ্টিতত্ত্বে প্রগতির স্থান নেই বলেই ভারতে ইতিহাস চেতনা গড়ে ওঠেনি। হিন্দুদের মতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের পুনরাবৃত্তি চলে অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের লীলায়। অতএব কোন খণ্ডকালের ঘটনাপঞ্জী মহাকালের দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই অর্থহীন। ইতিহাস চেতনা তাই হিন্দুদের মতে ভ্রান্ত চেতনা, আর কোন ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত ঐতিহাসিক উদ্যোগ প্রজ্ঞাহীনতার পরিচায়ক। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে সংখ্যাতত্ত্বের অতীত কোন মহাসুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী ধ্বংস হবার ভয়ে এদেশের মানুষ কোনরকম ঐতিহাসিক উদ্যোগ থেকে বিরত থেকেছে। এ ধরনের সৃষ্টিতত্ত্বে তন্ময় হয়ে কোন সাধক সাংসারিক কর্মকাণ্ড পরিহার করে ব্রহ্মবিহারী হবার সাধনা করেছেন, তা সম্ভব। কিন্তু বিশ্বজীবনের প্রগতিহীন চক্রবৎ পরিবর্তনের অসারতায় মুহ্যমান হয়ে আমজনতা রুটিরুজির উন্নতির আশা পরিত্যাগ করেছে, এ যুক্তি বুদ্ধিনির্ভর নয়। এদেশের ইতিহাসবৈরাগ্যের মূল কারণের সন্ধান তাই অন্যত্র করতে হবে।

ভারতে ইতিহাস চেতনার অভাবের অর্থনৈতিক কারণের দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কার্ল মার্কস। মার্কসের মতে ভারতের অর্থনীতি বৃটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত পরিবারভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজে বিভক্ত ছিল। জমির যৌথ মালিকানা এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমে এই গ্রাম্য সমাজ একটা নিম্নস্তরের স্বয়ম্ভরতার ওপর দাঁড়িয়েছিল এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজগুলিই সব রকম কুসংস্কারের আস্তানা আর ইতিহাস চেতনা ও প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। ছোট এক টুকরো জমি আর কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে এই গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলি এতই অধঃপতিত হয়েছিল যে, একদিকে এরা বাঁদরের পুজো করত, আর অন্যদিকে যে কোন বিদেশী শক্তি এদেশের দিকে বিন্দুমাত্র নজর দিত, বিনা বাধায় তাদেরই শিকার হত। মার্কস তাই বলেছেন যে

ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত হয়েছে কিনা এটা কোন প্রশ্নই নয়, কারণ এদেশ নিশ্চয়ই অন্য কোন না কোন দেশের শিকার হত। সেদিক থেকে মার্কসের মতে একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশে তুর্কী, পারসিক কিংবা রুশীয় শাসন হলে ভালো হত, না বৃটিশ শাসন হয়ে ভাল হয়েছে। আর তাঁর উত্তর এই যে, বৃটিশ শাসন রেলওয়ে এবং শিল্পপণ্য দিয়ে ভারতের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলোর আর্থিক স্বয়ম্ভরতার বুনিয়াদ ভেঙে দিয়েছে, আর এই আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের শিল্পায়ন এবং অগ্রগতির পথ সুগম করেছে। মার্কসের মতে অতএব বৃটিশ শাসন ভারতের পক্ষে মঙ্গলকরই হয়েছে। কৃষি ও কুটির শিল্পের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে নিম্নস্তরের স্বয়ম্ভরতা ভারতীয় অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল, তার প্রধান কারণ হিসেবে মার্কস জাতিভেদ প্রথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জাতিভেদকে তিনি দেখেছেন একটি বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজন প্রতিষ্ঠানরূপে।

মার্কসের এ বিশ্লেষণ বহুলাংশে সত্য। কিন্তু জাতিভেদ প্রথাকে শুধুমাত্র একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানরূপে দেখলে এর সম্পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করা হয় না। ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে আর্যরা তিনটি বর্ণ নিয়ে এদেশে এসেছিল এবং বিজিতদের শূদ্র কিংবা দাস হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তাই আদিতে জাতিভেদ এদেশে শুধু শ্রম বিভাজন ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া পরবর্তীকালে বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন এত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সৃষ্টি হয়, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে জাতিভেদ এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়ে স্থায়ী সামাজিক রূপ নেয় যে, একে শুধু একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে ভুল করা হয়। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজের চিরন্তন স্থবিরতার পেছনে রয়েছে জাতিভেদরূপী মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার শেকড় শ্রম-বিভাজন কিংবা শ্রেণী বৈষম্যের চেয়ে সমাজের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে।

এদিকে মার্কসের আগে হেগেল এবং পরে ম্যাকস ওয়েবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হেগেল বলেছেন, যে সাংগঠনিক ক্রমবিকাশের ফলে সমাজের প্রগতি ও পুনর্বিন্যাস হয়, ভারতে সে সংগঠন প্রথম থেকেই জাতিভেদ ব্যবস্থার ফলে এক অচলায়তনের রূপ নেয়, আর এই অপরিবর্তনশীল ব্যবস্থার ফলে সমাজ ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যের চেতনা হারিয়ে ফেলে। তাঁর মতে জাতিভেদ ব্যবস্থাই অতএব ভারতের ঐতিহাসিক চেতনা এবং প্রগতির অভাবের মূল কারণ। ম্যাকস ওয়েবার প্রশ্ন তুলেছেন, ইউরোপে যখন শিল্পবিপ্লব হয়, সে সময়ে ভারতের আর্থিক বুনিয়াদ এবং উন্নতির পর্যায় ইউরোপের চেয়ে পেছনে ছিল না; তবে ভারতে শিল্পবিপ্লব না হয়ে ইউরোপে হল কেন? উত্তরে তিনি বলেছেন, ইউরোপের মত ভারতে ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে ধর্মকে পৃথিবীমুখী করা হয়নি, আর তার কারণ জাতিভেদের অচলায়তন। যে সামাজিক এবং আর্থিক সঞ্চরণশীলতা থেকে সমাজে নূতন চিন্তাধারা এবং উদ্যোগ সৃষ্টি, ভারতে চিরন্তন জাতিভেদ প্রথার অভ্যন্তরে তা সম্ভব ছিল না। প্রখ্যাত ইতিহাসবিজ্ঞানী আরনলড টয়েনবিও জাতিভেদ প্রথাকে ভারতে ইতিহাস চৈতন্যের এবং অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেন। একই অভিমত ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, বাইরের পৃথিবীতে যখন প্রতিযোগিতা ও আঘাত-সংঘাতের মাঝে বিরামহীন ইতিহাস সৃষ্টি চলছিল, আমাদের গ্রাম্য সমাজ তখন বিধিনিষেধের কুসংস্কারে বেষ্টিত হয়ে নিজের সংকীর্ণ এবং অপরিবর্তনশীল কক্ষপথে ঘুরে মরছিল।

জাতিভেদ প্রথার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এই ব্যবস্থায় সমাজের বৃহত্তম অংশকে কখনো মাথা তুলে মানুষের মত দাঁড়াতে দেয়া হয়নি। শূদ্র, অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী, এবং অস্পৃশ্যরা এদেশে চিরদিনই জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করা ছাড়া এদের আর

কোন অধিকার এ হতভাগ্য দেশ স্বীকার করেনি। তাই ইতিহাসের যারা প্রধান স্রষ্টা, সেই কৃষক-মজুর শ্রেণী চিবকাল নিপীড়িত হয়ে এসেছে এক মুষ্টিমেয় পরগাছা শ্রেণীর হাতে। রাজনীতি এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কাজ ছিল বলে এদেশের সাধারণ মানুষ কখনো দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ কিংবা অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। তারা ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ এবং শাসনের পরিবর্তন (দেশী কিংবা বিদেশী) সম্বন্ধে স্বভাবতই উদাসীন থেকেছে এবং নিজের জন্মলব্ধ কাজে লিপ্ত থেকেছে। আর ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে শাস্ত্রকার কিংবা তত্ত্বজ্ঞানী হিসেবে ব্যবহার করে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণী গায়ের জোরে এ ব্যবস্থাকে নিজ স্বার্থে বাঁচিয়ে রেখেছে। অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে জাতিভেদই এদেশে ইতিহাস চেতনার অভাবের প্রধান কারণ। জন্মলগ্নে বাঁধা জীবনের কর্মকাণ্ড, চিরন্তন বাধা-নিষেধের মধ্যে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং তার মধ্যেকার অসংখ্য ক্রিয়াকলাপ যন্ত্রের পুতুলের মত এদেশের মানুষকে চিরদিন উদ্দেশ্য-হীন, উদ্যোগহীন আর দেশ ও বহির্জগতের প্রতি উদাসীন করে রেখেছে। ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র 'জাতি'র লৌহ আবরণের মধ্যে জন্মলব্ধ কর্তব্য-অকর্তব্যকে অস্বীকার করে বৃহত্তর জাতি, দেশ কিংবা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা ব্যক্তি মানুষের পক্ষে বাস্তবে অসাধ্য ছিল।

কিন্তু তথাপি প্রশ্ন থেকে যায়, বাইরের পৃথিবীর পরিবর্তনের প্রভাবে এদেশে জাতিভেদ প্রথা ভেঙে গেল না কেন? আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই এদেশের ইতিহাস বিমুখতার ভৌগোলিক কারণে আসতে হয়। উত্তরে ও পশ্চিমে হিমালয় এবং কারাকোরাম পর্বতমালা, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, আর পূর্বে অবহিমালয়ের পার্বত্য অরণ্যভূমি ভারতকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাইরের পৃথিবী থেকে এতখানি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল যে ইতিহাসের অধিকাংশ সময় এদেশের মানুষ বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে চরম অজ্ঞতা এবং উদাসীনতা, আর নিজেদের সম্বন্ধে অতিশয় উচ্চ ধারণা পোষণ করত। মধ্যযুগীয় পর্যটক আলবেরুণী লিখেছেন যে ভারতের মানুষের মত বহির্জগৎ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ আর নিজেদের সম্বন্ধে এত ভ্রান্ত অহমিকার বশবর্তী মানুষ অন্য দেশের লোকের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। বিদেশীরা খাইবার গিরিপথ দিয়ে বার বার এসেছে আগ্রাসীর ভূমিকায়, আর খানদানি তরিকায় তাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে জাতিভেদের লৌহ আবরণের ভেতর ভারতীয় সমাজ আশ্রয় নিয়েছে, কচ্ছপ যেমন ভয় পেলে বাইরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হাড়ের খোলসের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ ও নিরাসক্ত ছিলাম যে আফগানিস্তানে বার বার নূতন শক্তির অভ্যুদয় হয়েছে, আর আমরা কখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি যে আক্রমণকারীরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছে—তাদের যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা দিয়েই আমরা আমাদের কর্তব্য সমাধা করেছি। প্রাচীনযুগে মাত্র একবারই ভারত এই ভৌগোলিক অবরোধ উত্তরণ করে দেশে দেশে নিজ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল, আর তা হচ্ছে বৌদ্ধ যুগে। জাতিভেদ এবং হিন্দুধর্মের অসার আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে বৌদ্ধধর্ম তখনকার পৃথিবীতে এক প্রগতিশীল ধর্ম হিসেবে স্বভাবতই দূর দূরান্তরে প্রভাব বিস্তার করে। সেই সঙ্গে সম্রাট অশোকের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সহায়তা করে। ক্রমশ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে (যদিও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে কিছু কিছু হিন্দু সম্প্রসারণও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হয়েছিল)। ভারতীয় সংস্কৃতি ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে প্রকৃত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির রূপ নেয়। কিন্তু ইতিহাসে যেমন অনেক উন্নত সংস্কৃতিই ভিতরে কিংবা বাইরে তুলনাক্রমে অনুন্নত সংস্কৃতির হিংস্র আক্রমণে পরাস্ত হয়েছে, তেমনি প্রাচীনপন্থী গোঁড়া হিন্দু সমাজের

আক্রমণে অনেক বর্বর অজাতশত্রুর হাতে অনেক বৌদ্ধ শ্রীমতী প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের পরাজয় ও অবলুপ্তি স্বীকার করল। আগ্রাসী হিন্দু সমাজ তার একমাত্র সম্বল জাতিভেদের ভিত্তিতে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। ভারতের ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে ঘোর দুর্দিন। আধুনিক যুগে যান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নত ইংরেজ জলপথে ভূগোলের বেড়া ভেঙে ভারতকে আবার বহির্বিশ্বের সামনে উন্মুক্ত করল, কিন্তু তারাও আগ্রাসীর ভূমিকায় এল বলে, এবং প্রথমার্ধে তাদের রাজ্যজয়, আর্থিক শোষণ এবং ধর্মপ্রচার ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলে, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তাদের বিশেষ কোন প্রভাব পড়েনি।

॥ ৩ ॥

উনিশ শতকে রামমোহন রায় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অনেকেই ভারতের আত্মচেতনা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টার পেছনেও গভীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নেই। যে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিতে রামমোহন এদেশে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে প্রয়াসী ছিলেন, সে পটভূমির বিশ্লেষণ কিংবা পরিবর্তনের কোন চিন্তা তাঁর কোন রচনায় পাওয়া যায় না। তিনি প্রধানত বেদান্তের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সমন্বয়ে নূতন ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করে-ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে সতীদাহ, ইংরেজী ভাষার প্রচলন প্রভৃতি কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক চিন্তার এই অভাব ছাড়াও সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ, শ্রেণী ও জাতিভেদের সর্বব্যাপী অসাম্য প্রভৃতির দিকে তাঁর বিশেষ কোন দৃষ্টির পরিচয় নেই। রামমোহন তাই নূতন ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারের প্রবর্তক হওয়া সত্ত্বেও ভারতের, এমনকি বাংলার আমজনতার ওপর এবং তাদের ইতিহাস চেতনার ওপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বঙ্কিম-চন্দ্রের চিন্তাধারায় ইতিহাস চেতনার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'আনন্দমঠ'এ 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, আর মা যা হইবেন', ভারতমাতার এই রূপচিত্রণ ইতিহাস চেতনারই পরিচায়ক। তাছাড়া বঙ্কিমের বিভিন্ন প্রবন্ধে ও উপন্যাসে সমাজের শ্রেণীচরিত্র এবং অসাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আংশিক সচেতনতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি বঙ্কিম-সাহিত্যে ইতিহাস চেতনা ছিল অর্ধসুপ্ত—টলস্টয় কিংবা গোর্কীর ইতিহাস চেতনার ভগ্নাংশও নয়। আর এই অর্ধসুপ্ত ইতিহাস চেতনা একদিকে যেমন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে ভারতের অস্থিমজ্জায় শিহরণ জাগিয়েছে, অন্যদিকে আবার তেমনি হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ সম্বন্ধে, শ্রেণীভেদ-জাতিভেদ সম্বন্ধে, এবং জনশক্তির উৎস যে দরিদ্র এবং নিপীড়িত নব্বই শতাংশ, তাদের সম্বন্ধে সচেতনতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম থেকে ফিরে আসবার পরে তিনি পিছিয়ে পড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সচেতনতারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই ইতিহাস ও সমাজ চেতনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল বেদান্তভিত্তিক ধর্মচিন্তা। তিনি বার বার বলেছেন, সারা দেশে প্রথমে ধর্মের বন্যা বইয়ে দিতে হবে, তারপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতি স্বচ্ছন্দে সৃষ্টি হবে। কি ভারতে, কি পূবে কি পশ্চিমে, তাঁর ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ধর্মোত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাসধর্মী রূপ নিতে পারেনি। এমনকি উনিশ শতকের শেষে রাজনীতিতে উত্তাল চীনে গিয়েও তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন ছাড়া আর কিছুই করেননি। স্বামীজীকে নিশ্চয়ই এজন্য দোষী

করা যায় না, কারণ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারক, অন্য কিছু বলে কখনো করেননি।

এই শতকের প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক রচনা ও কার্যকলাপে ইতিহাস চেতনার সুস্পষ্ট ছাপ ছিল, এবং সে যুগে তিনি যথার্থই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা ছিলেন। রাজনৈতিক জীবন পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করবার পরও তিনি রাজনীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন। কিন্তু এ সময়ে তাঁর বিভিন্ন চিন্তাগর্ভ রচনায় ইতিহাসের চেয়ে সৃষ্টিতত্ত্বেরই স্থান বেশী। ব্রহ্মশক্তির বিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন এই দুয়ের মধ্যে, এবং আরও অল্প পরিসরে পদার্থ থেকে অতিমানবীয় অস্তিত্বের দিকে জীবনের প্রগতির দর্শন কল্পনা এবং চিন্তাশক্তিকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। এরই মধ্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসকেও নিপুণভাবে বুনে দিতে শ্রীঅরবিন্দ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তথাপি মনে হয়, তাঁর ইতিহাসদর্শনের মধ্যে যেন ইতিহাসের চেয়ে মহাকালের প্রাধান্যই বেশী। কোন বিরাট মহাকাশে যেন অযুত-নিযুত বৎসর ধরে ব্রহ্মশক্তির পথ-পরিক্রমা চলেছে, তার মধ্যে কোটি কোটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, বিশেষ করে সমাজের নিপীড়িত গরিষ্ঠ অংশের আর্তনাদ নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদনির্ভর ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের স্থবিরতার যে সমালোচনা করেছেন, তা থেকে তাঁর কিছুটা ইতিহাস দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি শিল্প ও বিজ্ঞানের পরিকল্পিত প্রগতির মাধ্যমে ভারতের বহুমুখী উন্নয়নের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং এ থেকেও তাঁর আংশিক ইতিহাসমনস্কতা প্রমাণ হয়। 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কবিতায়ও ইতিহাসদর্শনের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাস চেতনা কাব্য এবং দর্শনের গণ্ডী অতিক্রম করে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে পারেনি। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর ইংরেজী রচনা থেকে দেখা যায়, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা তাঁর কাছে ছিল শুধুই সাংস্কৃতিক সংজ্ঞাবিশিষ্ট। ভারতের সঙ্গে বৃটেনের ঐতিহাসিক সংঘাতকে তিনি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেষ্টা করেননি, এবং সে কারণে 'স্যার' খেতাব বর্জন করলেও তিনি গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনকে মৌলিক সমর্থন জানাতে পারেননি। "পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে"—'ভারততীর্থ' কবিতার এই স্তবকটিই ভারত-বৃটেন সম্পর্কের ঐতিহাসিক স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর চেতনার অগভীরতার পরিচায়ক। এই ধরনের চিন্তাধারার ফলে চীন ও জাপান ভ্রমণকালে এই দুই দেশে তাঁর প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তবে কবি রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতিবিজ্ঞানী হিসেবে দেখলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনে ইতিহাস চেতনা সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট রূপ নেয়। গণশক্তিকে জাগ্রত, সংহত এবং সচেষ্ট না করে যে রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রগতি সম্ভব নয়, এ সত্য নবীন ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই খানদানি আবেদন-নিবেদনের পালায় যবনিকা টেনে এবং হিংসাশ্রয়ী বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধের পন্থাকে বর্জন করে, সত্যাগ্রহ এবং গঠনমূলক কার্যসূচীর মাধ্যমে তিনি বিরাট গণজাগরণ ও ঐতিহাসিক চেতনা সৃষ্টিতে সফল হয়েছিলেন। তিনি যে তরিকায় আন্দোলন পরিচালনা করতেন, তার মধ্যেও ইতিহাস চেতনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটবড় সমস্ত সত্যাগ্রহ এবং গঠনমূলক কার্যক্রম তাঁর নেতৃত্ব দিনক্ষণ তারিখ বেঁধে এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিচালিত হত। তাঁর ব্যক্তিগত সময়ানুবর্তিতা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে গভীর ইতিহাস চেতনার চিহ্ন রেখে গেলেও মহাত্মা

গান্ধীর চিন্তাধারায় এদেশের সনাতন কালোত্তীর্ণ একটা দিক প্রচ্ছন্ন ছিল। যে গ্রাম-ভিত্তিক নৈরাজ্যবাদকে তিনি আজীবন তাঁর প্রকৃত এবং অন্তিম আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের, আর গতিশীল ও সংঘাতময় ইতিহাসের-চেয়ে অনাহত মহাকালের প্রতিধ্বনিই যেন বেশী শোনা যায়।

॥ ৪ ॥

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইতিহাস চেতনা আমজনতার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে কিভাবে ভারতের গণশক্তির সমূহ বিকাশ ঘটাতে পারে, আর এদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে গতিশীল করে তুলতে পারে। আগের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, ভারতীয় ঐতিহ্যে ইতিহাস চেতনার মূল কারণ দুটি—ভারতের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং জাতিভেদ প্রথা। আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার অবকাশ নেই, কারণ যান্ত্রিক প্রগতি প্রায় সব প্রাকৃতিক বাধাকেই অতিক্রম করতে পেরেছে। কিন্তু প্রধানত রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ আজও তার ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। স্বাভাবিক ভৌগোলিক পরিবেশ হল এশিয়া মহাদেশ। কিন্তু এই এশিয়া মহাদেশে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক না থাকাতে এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে এক অসম এবং কিছুটা অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছি। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের আত্মশক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক বশত আমরা শুধু পাকিস্তান থেকেই নয়, আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। চীনদেশের সঙ্গে অপ্রীতিকর সম্পর্ক বশত আমরা শুধু যে সেই বিরাট দেশের বিপুল জনসমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি তাই নয়, এশিয়ার রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে পারছি না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ব্রহ্মদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক গভীর করে তোলা সম্ভব হয়নি। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে ট্রেনে উঠে অনায়াসে আরেক প্রান্ত অবধি যাওয়া যায়। কমন মার্কেটের মাধ্যমে অর্থনীতি এবং রাজনীতিক্ষেত্রে এই গতিশীলতা আরও অনেক বেড়েছে। কিন্তু ভারতীয়রা কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যাতায়াত করতে পারেন না। ফলে এদেশের আমজনতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজও প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এর জন্য যে একমাত্র ভারতবর্ষ দায়ী তা নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কখনো কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেক সময় কোন বিশেষ দেশের নীতি ও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু এশিয়ার এ বেড়া ভাঙতে না পারলেও ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাস চেতনার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব নয়। বিদেশ নীতিতে যুগান্তকারী বলিষ্ঠ প্রয়াসের মাধ্যমেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব।

ইতিহাসবৈরাগ্যের আরও মৌলিক সমাধান নির্ভর করছে জাতিভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদের ওপর—যে প্রথা এদেশের শতকরা ৯০ জন মানুষের শক্তি হরণ করছে যুগ যুগ ধরে। যে সমাজ জন্মগতভাবে সব মানুষকে সমান বলে স্বীকার করে না, সেখানে আর্থিক ও রাজনৈতিক সাম্য সুদূর পরাহত। যে সমাজে একদল মানুষ কোটি কোটি অন্য মানুষের হাতের অন্ন গ্রহণ করতে, এমনকি তাদের স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করে, সে সমাজের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। দারিদ্র্য দূর কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল আর্থিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শক্তি ও সাহস সে সমাজের সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না, কারণ যুগযুগান্তের অন্ধ কুসংস্কার সমস্ত

বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে সেখান থেকে নির্বাসিত করেছে। আর মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংগঠনের এই নারকীয় রূপকে অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাওয়া, জাতিভেদের জগদ্দল পাথরকে ভারতের বুক থেকে সরিয়ে নেয়া, শুধুমাত্র সংবিধানের মাধ্যমে, আইন পাশ করে অথবা প্রশাসনিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। সমাজের গভীর কুসংস্কার যে এভাবে নির্মূল করা যায় না, এ সত্য সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অনেকে মনে করেন যে আর্থিক উন্নতি ও শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের অভিশাপ আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা জানেন যে আর্থিক বিকাশ বা শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে জাতিভেদের অবলুপ্তির বিশেষ সম্পর্ক নেই। দুইই স্বাধীন ভারতে অনেক হয়েছে, কিন্তু জাতিভেদে বিশ্বাস বিশেষ কমেনি। যাঁরা তা মনে করেন তাঁদের গ্রাম্য ভারত সম্বন্ধে মামুলি জ্ঞানও নেই, যে ভারতে আজও হরিজনদের পুড়িয়ে মারা হয়। আর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহরবাসীদের জাতিভেদে মৌলিক বিশ্বাস সংবাদপত্রে বিয়ের বিজ্ঞাপনগুলো থেকে অতি সহজে ধরা পড়ে। পরন্তু, গুনার মিরডাল প্রভৃতি অনেকে দেখিয়েছেন যে প্রকৃতপক্ষে আর্থিক বিকাশের পথেই জাতিভেদ এক প্রধান অন্তরায়। অতএব আর্থিক উন্নতি দ্বারা জাতিভেদ দূর করা সম্ভব নয়। ভারতীয় এবং বিদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এও লক্ষ্য করেছেন যে জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় গণতন্ত্রের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে এবং রাজনীতি ও নির্বাচনকে আশ্রয় করে পুষ্টিলাভ করছে।

জাতিভেদবিরোধী আন্দোলনের চেয়ে শ্রেণী সংগ্রাম বেশী প্রয়োজন কিনা, এ প্রশ্নও উঠতে পারে। কোন্ আদর্শ ও পন্থা মোতাবেক শ্রেণী সংগ্রাম হওয়া উচিত তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে এবং থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু শোষিতশ্রেণীর আত্মচেতনা ও ইতিহাস চেতনা যে গণশক্তির বিকাশের প্রধান সোপান, সে বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। আর বস্তুত জাতিভেদ শ্রেণীবৈষম্যের চেয়ে গভীরতর এবং ব্যাপকতর অসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব শোষণ ও শ্রেণীবৈষম্য দূর করবার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে এই গভীরতর সত্যও সহজেই প্রতীয়মান হবে যে এদেশে বিদেশী ধরনের শ্রেণী-সংগ্রামের চেয়ে ব্যাপকতর এবং কঠিনতর জাতিভেদ-বিরোধী দুর্বার গণআন্দোলন অপরিহার্য। জন্মগত জাতিভেদের লৌহপ্রাকার চূর্ণ করে যে দুর্জয় বিপ্লবী বেরিয়ে আসবে, আর্থিক শোষণের শেকল সে একটানে ছিঁড়বে। তার পাদস্পর্শে অহল্যাদেশের পাথরঘুম ভাঙবে।

অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে এদেশে যেভাবে ব্যাপক হারে হরিজন নিধন, হরিজনের গ্রামে অগ্নিসংযোগ এবং হরিজন নিপীড়ন চলছে, তা দেখে মনে হয় যে লজ্জায় মরে যাওয়া যদি সত্যি সত্যি সম্ভব হত, তাহলে আমরা এদেশের অনেক মানুষ বহুদিন আগেই লজ্জায় মরে যেতাম। অথবা যতখানি মনুষ্যত্ব থাকলে গুরুতর অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ গভীর লজ্জা, ঘৃণা অথবা বিদ্রোহী চৈতন্য অনুভব করে, ততখানি মনুষ্যত্ব থেকে আমরা এদেশের হাজার হাজার তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষেরা, আজও অনেক নীচে আছি। আর আমাদের চেয়েও আরো অনেক নীচে ফেলে রেখেছি সেই অগণিত মানুষকে, যে-কোন দেশেই যারা গণশক্তির প্রকৃত উৎস, ইতিহাসের যারা প্রাণশক্তি, কালের রথ যাদের করস্পর্শে সচল হয়। সবার পিছে সবার নীচে যে অযুত নিযুত মানুষ আজও অস্পৃশ্য হয়ে পড়ে আছে, তাদের স্পর্শের অভাবেই এদেশের প্রগতির চাকা আজও অচল। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ এদেশের গণশক্তির সংহতি এবং স্ফুরণের পথে প্রধান অন্তরায়, অতএব প্রগতির পথেও প্রধান প্রতিবন্ধক।

প্রাচীন কাল থেকে তথাকথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং জাতিভেদ প্রথার অবিচ্ছেদ্য এবং প্রধান আঙ্গিক হিসেবেই এদেশে অস্পৃশ্যতার কলুষ গড়ে উঠেছে। সম্ভবত বিদেশী আগ্রাসনের ফলেই তথাকথিত অস্পৃশ্যরা প্রথমে সমাজের একেবারে নীচের তলায় চলে যায়। ইতিহাসের আদিপর্বে আর্য আগ্রাসন বা সে-জাতীয় কোন বিদেশী শাসনের ফলেই এদেশের পরাজিত মানুষেরা প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হয়। আগ্রাসীরা স্বভাবতই নিজেদের উচ্চ জ্ঞান করতে থাকে, এবং এদেশের পরাভূত মানুষদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং নীচে ফেলে সামগ্রিক শোষণ ও অত্যাচারের শিকারে পরিণত করে। তারপর থেকে কতকগুলো পুঞ্জীভূত কুসংস্কার কালক্রমে অস্পৃশ্যতাকে এদেশের জাতিবর্ণভেদ ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিকের রূপ দান করে। এসব কুসংস্কারের মধ্যে ছিল পেশাগত এবং নানা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পবিত্রতা-অপবিত্রতার ভ্রান্ত ধারণা, শুচিতা-অশুচিতা এবং কাল্পনিক সামাজিক উঁচুনীচুর বংশগতিতে অন্ধ বিশ্বাস, পূর্বজন্মের কর্মফল সংক্রান্ত বিজ্ঞান-বিরোধী ভ্রান্ত তত্ত্ব দিয়ে মানুষের সৃষ্ট অসম সমাজব্যবস্থার সমর্থন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার ঐশ্বরীয় উৎপত্তির তত্ত্ব প্রভৃতি। বলা বাহুল্য যে ইতিহাসের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অত্যাচারী এবং শোষক জাতিবর্ণগুলি নিজেদের কায়েমী স্বার্থের সুরক্ষা এবং পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যেই এসব তত্ত্ব সৃষ্টি এবং প্রচার করেছিল, আর ধর্মীয় অনুশাসন ছিল তাদের শোষণ শাসনের প্রধান হাতিয়ার। বৈশ্যদের অর্থ নিয়ে রাজারা নিজেদের তখ্‌ত-এ-তাউশ বজায় রাখতেন, রাজাদের সুরক্ষায় বৈশ্যরা

জনসাধারণকে শোষণ করতেন, আর এই দুই বর্ণের অন্নে প্রতিপালিত ব্রাহ্মণেরা তাদের এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে মানবতাবিরোধী ধর্মীয় অনুশাসন রচনা করে সামাজিক অসাম্যকে চিরায়ত করতে প্রয়াসী হতেন। এদেশের ইতিহাসের এই ধারার মধ্যে দিয়েই জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা পরস্পরের হাত ধরে বেড়ে উঠেছে।

ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগেই চতুর্বর্ণের বাইরে অবর্ণ বা পঞ্চম বলে একটি জাতি ছিল। এরাই অস্পৃশ্য। সম্ভবত তিনবর্ণে বিভক্ত আর্যজাতি প্রথমে এদেশের সব মানুষকেই শূদ্র বানিয়েছিল। তারপর কালক্রমে উপরে আলোচিত কারণগুলো থেকে শূদ্রদের একাংশ অস্পৃশ্যে পরিণত হয়, এবং তথাকথিত বর্ণাশ্রম ধর্মের বাইরে চলে যায়। আদিযুগের চতুর্বর্ণ কালক্রমে শত সহস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আদি-অন্তহীন মহীরুহে পরিণত হয়েছে, এবং বিশ্বের বিস্ময় হয়ে এদেশের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। এর নামই জাতিভেদ প্রথা। কোটি কোটি অস্পৃশ্যের ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য এই যে জাতিভেদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মধ্যে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে শুধু সকলের নীচে নয়,. সকলের স্পর্শের বাইরে। সেখানে এ অভাগা দেশ তার নিজের শক্তিকে হেলায় নির্বাসন দিয়েছে। অস্পৃশ্যের অধিকার শুধু একটি—সকলের পায়ের নীচে থেকে সকলের পদসেবা করা। তার কর্তব্যও শুধু একটি—সহস্র বৎসরের অপমান, অত্যাচার, লাঞ্ছনা বিনা প্রতিবাদে নীরবে সহ্য করা। এমনকি ভৌগোলিক দিক থেকেও অস্পৃশ্যরা তথাকথিত উচ্চজাতিদের স্পর্শের বাইরে। কারণ ভারতবর্ষ ভৌগোলিক দিক থেকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত—বর্ণ হিন্দুদের ভারতবর্ষ আর হরিজনদের ভারতবর্ষ। ভারতের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই বর্ণহিন্দু আর হরিজনদের বসবাসের স্থান আলাদা এবং পরস্পর থেকে কিছুটা ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থিত। শহরে পেশা এবং বসবাসের ব্যবস্থা কিছুটা ভিন্ন ধরনের হলেও একেবারে অন্য রকম নয়। কারণ কাজগুলো সর্বত্র হরিজনেরাই করে থাকেন। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রায় ৩৫ হাজার কর্মীর মধ্যে প্রায় ২৪ হাজারই হরিজন। এরা নোংরা পরিষ্কার করবার একচেটিয়া অধিকার ও সৌভাগ্য ভোগ করেন, এবং ধাপা-ট্যাংড়া-কসবা এলাকার বস্তিগুলোতে লোকচক্ষুর আড়ালে সুখে বসবাস করেন।

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে অস্পৃশ্যতার একটা গভীর আর্থিক ভিত্তি আছে, এবং জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। প্রধানত "নীচু" জাতদের মধ্যেই নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে কম রোজগারের পেশাগুলো সীমাবদ্ধ। বিশেষত হরিজনদের মধ্যে নিঃস্বতা এবং ভূমিহীনতা অত্যন্ত প্রকট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে হরিজনেরা জনসংখ্যায় প্রায় ১৭ শতাংশ, কিন্তু তারা ভূমিহীনদের প্রায় ৪৫ শতাংশ। অন্য কোন কোন রাজ্যে এ আর্থিক বৈষম্য আরও তীব্র। অর্থাৎ বহুশত বৎসর ধরে জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে জোর করে নীচে ফেলে রেখে তাকে ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করেছে সমাজের শক্তিশালী অপর অংশ। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর তাঁর বিভিন্ন রচনায় অস্পৃশ্যতার এই কাঠামোগত আর্থিক দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে হিন্দু সমাজ কখনো অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে কার্যক্ষেত্রে সম্মত হবে না, কারণ এ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বর্ণ-হিন্দুরা বিনা পারিশ্রমিকে কিংবা নামমাত্র পারিশ্রমিকে কোটি কোটি মানুষকে খেত-খামারে, কল-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে এবং নগরে-বন্দরে বেগার শ্রমিক হিসেবে পাচ্ছে। আর এ শোষণের মাধ্যমেই হিন্দু সমাজ তার উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-অনুষ্ঠান, এবং বর্ণহিন্দুরা তাদের আধিপত্য এবং আড়ম্বর বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। ডঃ আম্বেদকরের এই বিশ্লেষণ যে আজও বহুলাংশে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব শ্রেণীবৈষম্য এবং শ্রেণীশোষণের সঙ্গে অস্পৃশ্যতা-

ব্যবস্থার মৌলিক সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সঙ্গে শ্রেণীভেদের কোনই পার্থক্য নেই, এবং আর্থিক শোষণই এ ব্যবস্থার একমাত্র কারণ। বিদেশী আগ্রাসন এবং ধর্মীয় অনুশাসনে প্রথম পর্যায়ে এদেশের সাধারণ মানুষদের এক বড় অংশকে কতকগুলো অপরিচ্ছন্ন এবং বিনা বেতন কিংবা স্বল্প বেতনের কাজে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু জাতিভেদের বিভিন্ন বাধানিষেধ এবং সার্বিক কুসংস্কারের ফলে এই শ্রেণীর মানুষদের আর কখনোই সমাজের নীচের তলার এই কাজগুলো থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। তেমনিভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে চতুর্বর্ণেরও একটা শ্রেণী-চরিত্র ছিল। কালক্রমে ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের মাধ্যমেই এই চতুর্বর্ণ থেকে হাজার হাজার তথাকথিত জাতি সৃষ্টি হয়েছে, শুধুমাত্র আর্থিক কারণ থেকে নয়। স্বল্প বেতনের কাজ অস্পৃশ্য ছাড়াও এদেশের লক্ষ লক্ষ অন্য জাতির মানুষেরা করে থাকেন। কিন্তু তাদের সে কারণে অস্পৃশ্য করে রাখা হয়নি। আবার যেসব তথাকথিত অস্পৃশ্যরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোন কারণে বর্তমান যুগে তাদের বংশানুক্রমিক পেশার বাইরে চলে আসতে পেরেছে, তারাও অস্পৃশ্য বলেই গণ্য হচ্ছে, সামাজিক সাম্য কিংবা স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এদেশে একই আয়স্তরের মানুষেরা সর্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ-নীচ জাতিতে বিভক্ত, আবার একই জাতির মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন আয়স্তরে বিভক্ত। আর্থিক বৈষম্য এবং সামাজিক ভেদাভেদ পরস্পর সমান্তরাল নয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্ তো নয়ই। তাছাড়া ভারতবর্ষে বর্ণহিন্দু এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে যে ভৌগোলিক ব্যবধানের কথা আগেই বলা হয়েছে, তারও একমাত্র কারণ আর্থিক নয়। মূল গ্রামের ভেতরেও অনেক দরিদ্র লোক বাস করে যারা অস্পৃশ্য নয়, আবার অস্পৃশ্য যদি তার আর্থিক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতিও করতে পারে, তথাপি সে মূল গ্রামের ভেতর বসবাস করবার অধিকার পায় না।

অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার মূলে আর্থিক শোষণ এবং পুঞ্জীভূত অপসংস্কৃতি দুইই বর্তমান। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরণ এবং পরিবর্ধন করে। শত শত বৎসরের পুঞ্জীভূত অপসংস্কৃতি কোটি কোটি মানুষকে সামাজিক এবং আর্থিক কাঠামোর একেবারে নীচের তলায়, প্রায় মাটির নীচে, আবদ্ধ করে রেখেছে। আবার তাদের এই সবার পিছে সবার নীচে অবস্থিতি তাদের বিরুদ্ধে কুসংস্কারকে যুগ যুগ ধরে সুদৃঢ় করেছে। বহুযুগ নির্মিত আর্থিক শোষণের কাঠামো এবং শীলীভূত অপসংস্কৃতির কাঠামো নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অচলায়তনকে এদেশের বুকে চিরায়ত করে রেখেছে।

এদিক থেকে এদেশের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ-ব্যবস্থা এবং আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থার তুলনা করা চলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষবাদের সঙ্গে এদেশের অস্পৃশ্যতার বেশ কিছু মিল আছে। আর্থিক শোষণ উভয় ব্যবস্থারই অন্যতম মৌলিক কারণ। উভয় ক্ষেত্রেই কুসংস্কার, ঘৃণা এবং অপসংস্কৃতির কাঠামোর সঙ্গে আর্থিক কাঠামো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উভয় ব্যবস্থাতেই আর্থিক এবং সামাজিক ব্যবধানের সঙ্গে ভৌগোলিক ব্যবধানও বিদ্যমান। দুই ক্ষেত্রেই নিপীড়িতদের দুর্দশা জন্মগত এবং বংশানুক্রমিক। কিন্তু অন্তত তিনটি মৌলিক পার্থক্যও আছে। প্রথমত, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষবাদ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট। আর এই শ্বেতকায়দের অপশাসন আধুনিক আন্তর্জাতিক নয়া সাম্রাজ্যবাদের সহায়তাতেই বেঁচে আছে। কিন্তু ভারতে অস্পৃশ্যতা ঐতিহাসিক যুগে এদেশের মানুষেরই সৃষ্টি, যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিঃসন্দেহে আমাদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক বহিরাক্রমণের উল্লেখ

এখানে নিরর্থক, কারণ এ ধরনের আগ্রাসন পৃথিবীর সব দেশেই ঘটেছে, আর বর্তমান সামাজিক-আর্থিক কাঠামোর জন্য তাকে দায়ী করলে ইতিহাসের কোন অর্থ থাকে না। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর বলপ্রয়োগে অপশাসন কায়েম রেখেছে। কিন্তু এদেশে অস্পৃশ্যরা সংখ্যালঘু, মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশের মত। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এই শতকরা ২০ ভাগ মানুষের ওপর প্রায় দু হাজার বৎসর ধরে অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচার চালাচ্ছে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে তাই আমাদের অস্পৃশ্যরা আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের সংগে তুলনীয়। কিন্তু সেখানেও এই পার্থক্য থেকেই যায় যে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা আদিতে ছিল বহিরাগত ক্রীতদাস, পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতার শিকার। আর অস্পৃশ্যরা এদেশের ও সমাজেরই মানুষ। তৃতীয়ত, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষবাদের একটা বাহ্যিক লক্ষণ আছে, অর্থাৎ দেহের শ্বেত অথবা কৃষ্ণ বর্ণ এবং অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ দেশের অস্পৃশ্যতার সেরকম কোন বাহ্যিক লক্ষণ নেই। অস্পৃশ্যতার মূল শুধুই মানুষের মনের গভীর অন্ধকারে, চোখের আলোয় তা ধরা দেয় না।

এসব নিরিখে বিচার করলে ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতাকেই যেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের চেয়ে নিকৃষ্টতর মনে হয়। আমাদের দেশের সপক্ষে অবশ্য এ যুক্তি প্রায়ই দাঁড় করানো হয় যে এখানে জাতিভেদ সংবিধানে অস্বীকৃত এবং সরকারিভাবে ধিক্কৃত। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষবাদ সাংবিধানিক এবং সরকারিভাবে স্বীকৃত এবং সমর্থিত। অতএব দুয়ের মধ্যে কোন তুলনা করা চলে না। কিন্তু এ যুক্তি আংশিক সত্য মাত্র, মৌখিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অস্পৃশ্যদের উপর আক্রমণ এবং অন্যান্য নির্যাতনের সময় পুলিশ ও প্রশাসন কার্যত নিষ্ক্রিয় থাকে। ঘটনার পর কোন কোন সময় লোক দেখানো সক্রিয়তা প্রকাশ করে মাত্র। আর অস্পৃশ্যদের প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের অত্যাচারের বীভৎসতা এবং ব্যাপকতার তুলনায় বিচার-ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য শাস্তিই হয় না। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় গরীব মানুষের জন্যে সর্বদাই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, কিন্তু অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে সে বিয়োগান্ত নাটক আরও মর্মান্তিক। আইন ও ন্যায়ের মধ্যে এ দুস্তর ব্যবধানের মূল কারণ এই যে কোন দেশের প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থা বাগবৈখরী ঘোষণার উপর ভিত্তি করে চলে না। শব্দঝরা মায়াকান্নার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সামগ্রিক আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই চলে।

॥ ২ ॥

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতবর্ষের সনাতন দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ। প্রধানত দুই কারণে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ঃ তার চরম দারিদ্র্য এবং তার বেনজির খানদানি জাতিভেদ প্রথা। দুয়ের মধ্যে গভীর কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। কোন দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নতির পেছনে আছে তার গণশক্তির সংহতি ও বিকাশ। প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সংহত এবং গতিময় গণশক্তির মিলন হলেই সামগ্রিক উন্নতি, বিশেষত আর্থিক উন্নতি, ত্বরান্বিত হয়। আর জনশক্তির এই সংহতির জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমের সঞ্চরণশীলতা। কিন্তু এদেশে অস্পৃশ্যতাসহ জাতিভেদ প্রথা বহুযুগ ধরে শ্রমের এ সঞ্চরণশীলতাকে স্তব্ধ করে রেখেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিস্থিতি ইংলণ্ডের চেয়ে অনগ্রসর ছিল না। কিন্তু শিল্প বিপ্লব

ভারতে সংঘটিত না হয়ে ইংলণ্ডেই হল। এ ঘটনার একটি প্রধান কারণ অবশ্য সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ থেকে লব্ধ ব্রিটিশ মুনাফা। কিন্তু মার্কস, ম্যাকস ওয়েবার, হেগেল, স্পেংগলার এবং টনি প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী চিন্তাবিদ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কালে এদেশের আর্থিক গতিহীনতার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল জাতিভেদ প্রথা। স্বাধীনতার পরবর্তী সাড়ে তিন দশকেও একই কারণ আমাদের দ্রুত আর্থিক প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চায়েতী রাজ, সামূহিক বিকাশ যোজনা, ভূমি সংস্কার, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি উন্নয়নের বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিকল্পনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাগজি পরিকল্পনার গণ্ডী অতিক্রম করে বেশী দূর এগুতে পারেনি। এই পরিস্থিতির একটি প্রধান কারণ এই যে, আমলাশাহীর পক্ষে এ ধরনের কোন সাংগঠনিক কার্যক্রম রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তার জন্য সংঘবদ্ধ গণপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। আর এই সংঘবদ্ধ গণপ্রয়াসের অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ জাতিভেদ প্রথা, যার নিকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ হল অস্পৃশ্যতা।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথেও জাতিভেদ এক প্রধান অন্তরায়। রাজনৈতিক প্রগতির প্রধান উপকরণ হল গণচেতনার বিকাশ, এবং জনগণের ন্যায্য অধিকারগুলোকে রূপায়িত করবার উদ্দেশ্যে গণ আন্দোলন। এ ধরনের গণচেতনা কিংবা সংঘবদ্ধ গণ আন্দোলনের মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা, মানবিক মূল্যবোধ, এবং নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রবণতা থাকা প্রয়োজন। তবেই একে রাজনৈতিক প্রগতির লক্ষণ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতারূপী অপসংস্কৃতির প্রভাবে এদেশে এ ধরনের প্রগতিশীল গণচৈতন্যের ধারা স্তব্ধ হয়ে আছে। কারণ জন্মগত অসাম্যের তত্ত্ব ও বিশ্বাস, এবং তার ভিত্তিতে রচিত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মূলত কোন রকম বিশ্বজনীন এবং মানবিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। জাতিভেদ, বিশেষত অস্পৃশ্যতা শুধু যে আমাদের সমাজকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত করে রেখেছে তাই নয়, আমাদের চৈতন্যের পরিধিকেও রেখেছে অত্যন্ত সীমিত করে। যে-দেশের মানুষ চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছে যে জন্মগতভাবে সবাই অসমান, এবং আশৈশব তাদের বাস্তব সামাজিক পরিবেশে এ তত্ত্বের প্রতিফলন দেখেছে, সে দেশের মাটিতে বিশ্বজনীন সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বীজ অংকুরিত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ব্যক্তি চৈতন্যের উর্ধ্বে আছে পারিপার্শ্বিক চৈতন্য, আর তার উপরে আছে জাতপাতের ভ্রান্ত চৈতন্য। বিশ্বমানবিক চৈতন্য এদেশে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে কখনও কখনও বিকশিত হলেও সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যে কোনকালেই লক্ষ্য করা যায়নি। অতএব এ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক গণতন্ত্র কিংবা আর্থিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব এদেশে জনমানসের গভীর প্রবেশ করা প্রায় অসাধ্য। এ ধরনের সনাতন অপসংস্কৃতি বর্তমান থাকলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র মুখের বুলিই থেকে যেতে বাধ্য।

সম্প্রতি রাজনীতি বিষয়ে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের এক সম্প্রদায় এবং তাদের ভারতীয় তল্পীবাহকেরা বলতে আরম্ভ করেছেন যে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সংগে গণতন্ত্রের কোন বিরোধ নেই। জাতিভেদ প্রথার মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর দাবিগুলি উপস্থাপিত হয়, এবং এসব বিভিন্ন দাবিদাওয়ার সংঘাত এবং সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই গণতন্ত্র সার্থক হয়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের চিন্তাজগতে পশ্চিমের নয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সম্বন্ধে যারা অবহিত, তাদের কাছে এ এক অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর, সুপরিচিত এক ঐতিহাসিক নাটকের বহুশ্রুত এক সংলাপ। এ তত্ত্ব মানতে হলে যে কোন রকম সংঘাত ও দ্বন্দ্বকেই প্রগতিশীল এবং গণতন্ত্র বিকাশের পথ বলে গণ্য করতে হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হরিজন নিধনের নিয়মিত জাতীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি সবই গণতন্ত্রের

পন্থা বলে বিবেচিত হবে। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মত বিদগ্ধ চিন্তাবিদ, সংবিধান-রচয়িতা এবং জাতীয় নেতার নামে মারাঠাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নামান্তরের প্রস্তাব নিয়ে মহারাষ্ট্রে যে বীভৎস সংঘাত ঘটে গেছে, তাকেও গণতন্ত্রের প্রকাশ বলেই চিহ্নিত করতে হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, মানবিক মূল্যবোধ বিরোধী ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাত গণতন্ত্রের পরিপূরক নয়, সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ধরনের ক্ষুদ্র চৈতন্য এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের রাজনৈতিক উত্তরণই গণতন্ত্রের প্রথম সোপান।

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের ফলে এদেশের সাংস্কৃতিক জাগরণও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বৈষম্যমূলক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ফলশ্রুতি হিসেবে এদেশের সংস্কৃতি প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। একদিকে তিন প্রধান তথাকথিত উচ্চবর্ণের জাতিদের মধ্যে একধরনের উচ্চমার্গী নৃত্যগীত এবং অন্যান্য শিল্পকলা গড়ে উঠেছে, যার সঙ্গে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। এ সংস্কৃতি ব্যক্তিগত নিপুণতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চ ব্যাকরণে বাঁধা। এর মধ্যে জনসাধারণের কোন যৌথ অংশগ্রহণের অবকাশ নেই, নেই কোন বলিষ্ঠতা অথবা শক্তির প্রকাশ। অপরপক্ষে শূদ্র এবং হরিজনদের মধ্যে আজও বলিষ্ঠ গণসংস্কৃতির অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। এদিক থেকে এদেশের আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীচের তলার মানুষের এই বলিষ্ঠ লোকসংস্কৃতির বিকাশ এবং ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সম্ভব, শুধুমাত্র তথাকথিত উচ্চজাতির মানুষের উম্মার্গী দুর্বল সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে নয়। উনিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের তথাকথিত সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সত্যিকারের কোন নবজাগরণ আনতে পারেনি, কারণ পল্লবগ্রাহী এবং ধর্মভিত্তিক এই নয়া সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সমাজের ওপরতলার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে সুড়সুড়ি দিয়ে গেছে মাত্র, নীচের তলার গরিষ্ঠ জনসাধারণের মনকে দোলায়িত করতে পারেনি। আর এ অপারগতার পেছনে রয়েছে সনাতন জাতিভেদ প্রথা। স্বাধীনতা লাভের ৩৫ বৎসর পর আজও কোন সাংস্কৃতিক নবজাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, আর এর প্রধান কারণ এই যে সনাতন জাতিভেদ প্রথা সমস্ত বাগাড়ম্বরের মধ্যে আজও অচল হয়ে বসে আছে।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অক্টোপাস বন্ধনে বাঁধা এদেশের সংস্কৃতি মুক্তি পাচ্ছে না বলেই একশ্রেণীর যুবক-যুবতীর মধ্যে নানারকম অপসংস্কৃতি, উপসংস্কৃতি এবং অবসংস্কৃতি গড়ে ওঠবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অপসংস্কৃতির উদাহরণ হচ্ছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপে যুবক-যুবতীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। এর সঙ্গে তথাকথিত ধর্মগুরুদের ভজনার সাম্প্রতিক প্রাবল্যেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। উপসংস্কৃতির উদাহরণ জ্যাজ্, পপ্, রক-অ্যান্ড-রোল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য নৃত্যগীত, যার প্রসার বিত্তবানদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর অবসংস্কৃতির লক্ষণ হল মদ্য, মাদক, অশ্লীল সিনেমা এবং পত্রপত্রিকায় আসক্তি। এসব বিভিন্ন ধরনের ভ্রষ্ট সংস্কৃতির একটি কারণ অবশ্য উন্নতিশীল দেশে পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এবং নয়া সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজস। কিন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সামাজিক কাঠামোর একটি প্রধান দেশজ কারণ।

॥ ৩ ॥

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করবার উদ্দেশ্যে অনেক অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, কোন কোন সময় পরস্পরবিরোধী, মত প্রকাশ করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন উপায় নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীনতম মত ও উপায় হচ্ছে ধর্মীয় সংস্কার। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম তথা তন্ত্রাচার হিন্দুধর্মে নিহিত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আংশিক বিদ্রোহ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনেরও অন্যতম লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় প্রেমের বন্যায় অস্পৃশ্যতাসহ জাতিভেদকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেও অনুরূপ উদ্দেশ্য বর্তমান। আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জাতিভেদের বিরুদ্ধে, বিশেষত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় মতবাদ ব্যক্ত করেছে। কিন্তু এসব ধর্মীয় প্রচেষ্টার ফলে জাতিভেদের অচলায়তনে বিশেষ কম্পন অনুভব হয়েছে বলেও মনে হয় না, ফাটল ধরা কিংবা ভেঙে পড়া তো দূরের কথা। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই যে কায়েমী স্বার্থ দ্বারা সুরক্ষিত আর্থিক এবং সামাজিক কাঠামোকে কখনও ধর্মের আঘাতে ভেঙে ফেলা যায় না। ধর্মমোহ মানুষকে জাতিভেদের অপসংস্কৃতি থেকে ভ্রান্ত চেতনাপ্রসূত অপর এক অপসংস্কৃতির দিকে নিয়ে যায় মাত্র। ডঃ আম্বেদকর শেষ জীবনে বহুসংখ্যক অস্পৃশ্যকে সঙ্গে নিয়ে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করা সত্ত্বেও এদেশের অস্পৃশ্যদের, এমনকি সেসব ধর্মান্তরিত অস্পৃশ্যদেরও দুর্দশার কোন লাঘব হয়নি, কারণ তিনি বৈপ্লবিক সংগ্রামের কঠিন পন্থা বেছে না নিয়ে ধর্মান্তরের সহজ কিন্তু ভ্রান্ত পন্থা, অবলম্বন করেছিলেন। একই কারণে দলিত প্যান্থারদের একাংশের মধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণের যে মতবাদ এবং প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাকেও ভ্রান্ত চেতনার ফলশ্রুতি হিসেবেই গণ্য করতে হবে।

দ্বিতীয় মতবাদ এবং পন্থাকে গান্ধীমত অথবা গান্ধীপন্থা বলা যেতে পারে, আর তার সঙ্গে ধর্মান্তরের পূর্বে ডঃ আম্বেদকরের মতের তুলনা করা যেতে পারে। একথা প্রায় সকলেই জানেন যে মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে গেছেন, এবং এ-কাজকে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কাজের চেয়েও বড় কাজ মনে করতেন। এ বিষয়ে গান্ধীজীর চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে আলাদা করে দেখতেন, এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অনেক বললেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে জোর করে বিশেষ কিছু বলেননি। তাছাড়া উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের ধর্ম-সংস্কারকদের মতই চতুর্বর্ণ-ভিত্তিক সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি গান্ধীজীর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি মনে করতেন যে অস্পৃশ্যতা একটা সামাজিক পাপ, কিন্তু জাতিভেদ কোন পাপ নয়, একটা অবাঞ্ছিত সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। তার মধ্যে আবার আদিপর্বের চতুর্বর্ণ বাঞ্ছিত এবং কাঙ্ক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাকে গান্ধীজী তাঁর স্বপ্নের নৈরাজ্যবাদী সমাজের সাংগঠনিক ভিত্তি মনে করতেন। কিন্তু শত শত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত জাতিভেদ প্রথাকে অবাঞ্ছিত জ্ঞান করতেন। চতুর্বর্ণের মধ্যে অবশ্য কোন উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ তিনি অস্বীকার করতেন। এধরনের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতেই গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের হরিজন নামে নূতন নামকরণ করেন এবং এই নামে একটি কাগজ বের করেন। আর সারাজীবন ধরে হরিজনদের উন্নতিকল্পে নিজের পন্থায় কাজ করেন। এই কাজের আঙ্গিক ছিল হরিজনদের মন্দির প্রবেশ এবং রাস্তাঘাট দিয়ে যাতায়াতের অধিকার নিয়ে আন্দোলন, হরিজন বস্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার আন্দোলন, তাদের মধ্যে চরকা প্রচলন এবং কুটির শিল্পের বিকাশের চেষ্টা ইত্যাদি।

অস্পৃশ্যদের উন্নতির এই গান্ধীপন্থায় একটা বিশেষ দুর্বলতা এই ছিল যে এ পন্থায় হরিজনদের সামাজিক সাম্যের অধিকার অর্জন করা কিংবা সমাজের মধ্যে গৃহীত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ যতক্ষণ জাতিভেদ প্রথা সমূলে বিনষ্ট না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত অস্পৃশ্যরা চতুর্বর্ণের বাইরে অবর্ণ কিংবা পঞ্চমই থেকে যাচ্ছে। তার নাম হরিজন রাখলেও সকলের নীচে সংরক্ষিত তার স্থান থেকে ওপরে উঠে আসবার কোন সুযোগ তাকে দেয়া হচ্ছে না। অতএব নতুন নামকরণের ফলেও তাদের আর্থিক বা সামাজিক পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ প্রথারই নিকৃষ্টতম আঙ্গিক অতএব সমগ্র জাতিভেদ প্রথার ওপর প্রচন্ড আঘাত না হেনে শুধুমাত্র হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলে কিংবা তাদের বস্তি পরিষ্কার করলে তাদের সনাতন দুর্দশার কোন লাঘব হবার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। আম্বেদকর তাঁর বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায় একথা জোরের সঙ্গে বলে গেছেন যে জাতিভেদপ্রথাকে সমূলে ধ্বংস না করলে অস্পৃশ্যদের সামাজিক এবং আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির কোন অবকাশ নেই। প্রধানত এ কারণেই তিনি গান্ধীজীকে অস্পৃশ্যদের শত্রু মনে করতেন। আর জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দুসমাজ কখনো ত্যাগ করবে না এই উপলব্ধিজনিত নৈরাশ্য থেকেই শেষ বয়সে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ ছিল। এমনও সম্ভব যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারবাসীর যৌথ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তিনি জাতিসংঘাতের পন্থা থেকে বিরত থেকেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা এবং কার্যক্রমের ফলে এদেশে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কিছুটা নৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে এবিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্যত গান্ধীপন্থা অস্পৃশ্যদের সামাজিক এবং আর্থিক দুর্দশার লাঘব করতে বহুলাংশেই ব্যর্থ হয়েছে, এ-বিষয়েও দ্বিমত থাকবার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের তৃতীয় পন্থাকে সাংবিধানিক আখ্যা দেয়া যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের আমলে সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই এই প্রথা রাজনৈতিক স্থায়িত্ব লাভ করে। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনে এবং বর্তমান ভারতীয় সংবিধানে এদের তপসিলী জাতি নাম দিয়ে রাজনৈতিকভাবে পৃথক করা হয়েছে। এ তথ্য সুবিদিত যে বর্তমান সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে মানুষে মানুষে জাতিধর্মনির্বিশেষে সাম্যের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংবিধান বলেছে যে এসব বৈষম্য এতদ্বারা তুলে দেওয়া হল। তা ছাড়া পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য বিধান সভাগুলিতে আসনের একটি বিশেষ অংশ, এবং সরকারি চাকুরিতে একটি বিশেষ অংশ তপসিলী জাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা মাত্র দশ বৎসরের জন্য করা হয়েছিল। কিন্তু পরে আরও দুবার দশ বৎসর করে মেয়াদ বৃদ্ধি করে এখনও পর্যন্ত এসব সুযোগ-সুবিধা চালু রাখা হয়েছে। এ সাংবিধানিক পন্থাই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সরকারী এবং বেসরকারীভাবে স্বীকৃত এবং ব্যবহৃত পন্থা।

রাজনীতি এবং চাকুরির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের নীতি নিঃসন্দেহে সংবিধানের একটি বড় অবদান। সহস্র বৎসর ধরে হরিজনেরা আর্থিক শোষণ এবং সামাজিক ঘৃণার শিকার হয়ে এসেছে। এই ঘৃণাই তাদের নিঃস্বতা, অশিক্ষা এবং পেছিয়ে পড়ার জন্য দায়ী। আর বহুযুগের এই ঘৃণা, অবহেলা, দারিদ্র্য এবং অবমানবীয় জীবন তাদের মানবিক মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত করেছে। যে সমাজ এভাবে তাদের তিলে তিলে ধ্বংস করেছে কুসংস্কার আর অন্ধ বিদ্বেষে ভরা সে সমাজ কখনই নিজে থেকে তাদের সমান বলে গ্রহণ করত না, এবং রাজনীতি ও সরকারি চাকুরিতে সমান অধিকার দিত

না। তাদের সামান্যতম সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির জন্যও সাংবিধানিক অধিকারের প্রয়োজন ছিল। প্রধান প্রশ্ন এই নয় যে সাংবিধানিক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োজন ছিল কি না। প্রধান প্রশ্ন এই যে এ নীতি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া নারী, হরিজন এবং মুসলমানদের জন্য রাজনীতি ও সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মোট ৬০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। এতে অবশ্য কার ভাগে ঠিক কত শতাংশ পড়ত তা বোঝা যায় না। কারণ নারীজাতি জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক, এবং তাদের মধ্যে সম্ভবত আনুপাতিক হারেই হরিজন এবং মুসলমান আছেন। আবার হরিজন এবং মুসলমানদের মধ্যেও প্রায় অর্ধেক নারী আছেন। তবে একথা স্পষ্ট যে এ-বিষয়ে ডঃ লোহিয়ার বৈপ্লবিক চেতনা ছিল এবং তিনি সাংবিধানিক সংরক্ষণ নীতিকে সামাজিক অনগ্রসরতা দূরীকরণের একটি প্রধান হাতিয়ার মনে করতেন।

এই সংরক্ষণ নীতি নিয়ে সাম্প্রতিক কালে তথাকথিত উচ্চবর্ণের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে উষ্মার সঞ্চার হয়েছে, এবং এই নিয়ে অনেক রাজ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়ে গেছে। কিন্তু এই সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না যে দু হাজার বছরের পাপের মাশুল কিছুটা অন্তত দিতেই হবে, এবং সে মাশুল একদিনে শোধ হবে না। তবে এ প্রসঙ্গে আরও দুটি বিষয়ের অবতারণা প্রয়োজন। প্রথমত, এই অভিযোগ সর্বদাই পাওয়া যায় যে সাধারণ হরিজনেরা সংরক্ষণ নীতির সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। হরিজনদের মধ্যে যারা বর্ধিষ্ণু, তারাই রাজনীতিতে প্রভাবশালী, আর তারাই সব সুযোগ-সুবিধাগুলো কুক্ষিগত করে ফেলছেন। এই অভিযোগ সম্ভবত বহুলাংশে সত্য। অতএব সংরক্ষণ নীতির মধ্যে এমন একটি সূত্র যোগ করা উচিত যে একটি নির্দিষ্ট আয়ের উপরে হরিজনদের কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে হরিজন ছাড়া অন্য অনেক তথাকথিত অনগ্রসর বর্গের জন্যও সংরক্ষণ নীতি চালু করা হয়েছে. এবং এর ফলেই জাতপাত নিয়ে সংঘাত অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যে-দেশে প্রায় সব মানুষই গরীব, সেখানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা কতদূর বিস্তৃত করা যুক্তিসম্মত তা নিয়ে ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। অস্পৃশ্যদের মত অবমানবীয় দুর্দশা বোধ হয় অন্য হিন্দু জাতিদের নেই। এই বিস্তৃত সংরক্ষণ নীতির পেছনে কতখানি যুক্তিসম্মত কারণ আছে আর কতখানি আছে রাজনৈতিক সমর্থনলাভের তাগিদ, তা খতিয়ে দেখবার প্রয়োজন আছে।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সাংবিধানিক তরিকার দুর্বলতা এই যে এর মধ্যে সত্যিকারের সামাজিক এবং আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবহারিক যন্ত্র নেই। জাতিভেদ বিলোপের জন্যেও কোন সক্রিয় পন্থার উল্লেখ নেই। শুধু আইন দিয়ে সামাজিক-আর্থিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আজ পর্যন্ত কোন দেশে সম্ভব হয়নি, শুধুমাত্র সংবিধানের বড় বড় কথা লিখে তো নয়ই। ফলে আর্থিক ও রাজনৈতিক সুযোগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আরও ভালো করে বাসা বেঁধেছে। আর রাজনীতির ধুরন্ধরেরাও তাদের ব্যক্তিস্বার্থে এবং গোষ্ঠীস্বার্থে এই পরিস্থিতিকে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছেন। তাই ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যেই তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং নির্বাচন-ব্যবস্থা মানবতা বিরোধী জাতিভেদকে ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে।

তৃতীয় স্তরের পন্থাকে সাধারণ ভাবে মার্কসীয় বলা যেতে পারে, যদিও এর মধ্যে বিভিন্ন ধারা আছে। জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস বিশেষ কিছু লেখেননি। তবে তাঁর **Future Results of British Rule in India** নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ আছে। এ প্রবন্ধে মার্কস বলতে চেয়েছেন যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য

গোষ্ঠী পরিচালিত এবং অনগ্রসর প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় যে প্রাচীন শ্রম-বিভাজন ছিল তাতেই জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি নিহিত। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে ধর্মীয় কুসংস্কার এ ব্যবস্থা সহায়তা দিয়েছে এবং এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মার্ক্‌স মনে করেছিলেন যে ইংরেজ শাসনে ভারতে রেলপথের বিস্তার হচ্ছে আর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রসার হচ্ছে। এর ফলে আস্তে আস্তে প্রাচীন গ্রাম্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং কুসংস্কারের ভিতও আলগা হয়ে পড়বে। ফলে জাতিভেদ প্রথাও ক্রমশ বিলুপ্ত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে মার্ক্‌স জাতিভেদ প্রথাকে এ প্রবন্ধে ভারতের প্রগতির পথে এবং শক্তির বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় বলে রায় দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন যে ইংরেজ শাসনের আর যত দোষই থাকুক, প্রাচীন ক্ষুদ্র গ্রাম্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি কুসংস্কার ভাঙ্গবার ব্যাপারে ভারতে ব্রিটিশ ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল।

রেলপথ, শিল্পায়ন ও 'আধুনিক' সভ্যতার বিস্তারের মাধ্যমে জাতিভেদ ভেঙ্গে ফেলবার মার্কসীয় তত্ত্ব বর্তমান যুগে অনেক অমার্কসীয় চিন্তকও প্রচার করে থাকেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি এবং উল্লেখযোগ্য শিল্পায়ন হওয়া সত্ত্বেও মার্কসের স্বপ্ন সফল হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যত কমিশন প্রভৃতির রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। এর প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, প্রাচীন চতুর্বর্ণ থেকে বহুধা সম্প্রসারিত বর্তমান জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে শ্রম বিভাজনের কোন মিল নেই। দ্বিতীয়ত, পুঞ্জীভূত অপসংস্কৃতিকে শুধুমাত্র আর্থিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কিংবা আমদানী করা উপসংস্কৃতির সাহায্যে দূর করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সমকালীন মার্ক্‌সবাদীরা প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। একদল মনে করেন যে জাতিভেদ এদেশের কোন বিশেষ সমস্যা নয়, এবং কোন দেশেই এ ধরনের কোন বিশেষ সামাজিক সমস্যা এবং তার বিশেষ সমাধানের পন্থা থাকতে পারে না। কারণ ইতিহাসের গতি সর্বত্রই শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, এবং ভারতবর্ষ তার কোন ব্যতিক্রম নয়। শ্রেণীচেতনাই মানুষের প্রকৃত চেতনা। জাতি-চেতনা, ধর্মচেতনা প্রভৃতি আর সব ভ্রান্ত চেতনা। শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শ্রেণীচেতনার জন্ম হলে এসব ভ্রান্ত চেতনা নিজে থেকেই মিলিয়ে যাবে। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পৃথক আন্দোলন শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তাই নয়। এ ধরনের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীসংগ্রামকে বিপথগামী করে দিতে পারে।

এই মতবাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন দেশের বাস্তব পরিবেশকে উপেক্ষা করে কোন বিপ্লবের তত্ত্ব দাঁড় করানো যুক্তিসম্মত নয়। এদেশের মানুষের জাতিচেতনা তাদের শ্রেণীচেতনার পথেই এক বিরাট অন্তরায়। অতএব আগে তাদের শ্রেণীচেতনা জন্মাবে, পরে জাতিচেতনা উঠে যাবে, এ যুক্তি ধোপে টেঁকে না। কাল যদি এদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, আর তারপর যৌথ খামার নির্মাণের চেষ্টা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে গরীব ব্রাহ্মণ, গরীব মাহিষ্য, গরীব হরিজন আর গরীব মুসলমান এক সঙ্গে কাজ করতে, এক সঙ্গে থাকতে আর এক রান্নাঘরে খেতে সম্মত হচ্ছেন না। তখন হয় সৈন্য নামাতে হবে, নয়তো যৌথ খামার ভেঙ্গে যাবে। উভয় অবস্থাতেই সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত হবে। অতএব যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামভিত্তিক বিপ্লবে বিশ্বাস করেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে বিপ্লবের পূর্বে এবং পরে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলনের প্রয়োজন আছে।

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ-সংক্রান্ত মতবাদগুলির মধ্যে পরিশেষে উল্লেখ্য, মাও-

সে-তুং-এর চিন্তাধারা এবং কার্যক্রমের মধ্যে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাও বলেছেন, শ্রেণীসংগ্রামকে শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেও তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলতে হবে। এদেশের মার্ক্সবাদীদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী এ বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছে এবং তাদের কার্যক্রমে রূপায়িত করবার কিছুটা চেষ্টা করছে। মার্ক্সবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতকেই সবচেয়ে যুক্তিসম্মত মনে হয়। সম্ভবত মার্ক্স স্বয়ং এরকম প্রস্তাব সোৎসাহে সমর্থন করতেন। তবে যাঁরা অমার্ক্সবাদী, তাঁরা হয়ত জাতিভেদবিরোধী আন্দোলনকে শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে সম্মত হবেন না।

॥ ৪ ॥

যেকোন দেশের প্রগতির পক্ষে তার আর্থিক কাঠামো এবং সে কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এ সত্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে পুঞ্জীভূত অপসংস্কৃতি অনেক সময় একটা স্থায়িত্ব এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। গণচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখে এ অপসংস্কৃতি আর্থিক ক্ষেত্র সহ সব ক্ষেত্রেই প্রকৃত গণজাগরণকে প্রতিহত করে। তাই যেকোন প্রগতিশীল সামগ্রিক পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনায় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের একটা স্থান থাকা প্রয়োজন। এ বিশ্লেষণ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় আবহমান কাল ধরে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা চলে আসছে। আর সে ধারাবাহিকতার প্রধান ধারক এবং বাহক হচ্ছে সনাতন জাতিভেদ প্রথা। পুঞ্জীভূত অপসংস্কৃতির এই বহুযুগ লালিত শক্তিমান কাঠামোর উপর প্রচণ্ড আঘাত না হেনে এদেশের আর্থিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবার চেষ্টা অসফল হতে বাধ্য।

অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদবিরোধী সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্রথমত, কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যেও এদেশে অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ সহ ব্যাপক অপসংস্কৃতি বর্তমান। অতএব তাদের মধ্যেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রচার অভিযান চালানো প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কৃষক-শ্রমিকেরা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, কিন্তু অস্পৃশ্যরা জনসংখ্যায় মোট ১৯/২০ ভাগ মাত্র। তাদের পক্ষে একক ভাবে আন্দোলন করে সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। একদিকে শূদ্র, আদিবাসী প্রমুখ সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত অংশের সঙ্গে তাদের যৌথ আন্দোলনে নামতে হবে। আর অন্যদিকে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে "উচ্চবর্ণের" মধ্যেও ব্যাপক প্রচার অভিযানের প্রয়োজন আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এদের মধ্যে সব শ্রেণীর লোকই থাকতে পারে, কারণ সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অপসংস্কৃতি বর্তমান। অস্পৃশ্যরা যেহেতু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর সবচেয়ে নীচে চাপা পড়ে আছে, অতএব তাদেরই শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের পুরোধা হতে হবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে তাদের মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব নয়, যুক্তিসম্মতও নয়।

যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামকে অপরিহার্য মনে করেন তাঁদের অবশ্যই উচিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে শ্রেণীসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংগ করে তোলা। কিন্তু অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ এদেশের এমন একটি সর্বব্যাপী অপসংস্কৃতি যে এর বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে ন্যূনতম কার্যক্রমের ভিত্তিতে ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব আশু প্রয়োজন। বলা বাহুল্য,

প্রাথমিক পর্যায়ে তুলনাক্রমে সহজ কর্মসূচী নিয়ে আরম্ভ করে ক্রমশ কঠিনতর এবং ব্যাপকতর কর্মসূচীব দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সরকারি স্তরেও প্রাথমিক পর্যায়েই অনেক কিছু করবার আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে অস্পৃশ্যতা অনেক হাতে করা নোংরা কাজের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট। স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক স্যানিটারি ব্যবস্থা সর্বত্র সরকারি পরিকল্পনার আবশ্যিক আঙ্গিক করা প্রয়োজন। তার ফলে হাতে কিংবা মাথায় করে নোংরা বয়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, নিজের পরিষ্কার নিজেই করা যাবে। তেমনিভাবে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় তথাকথিত উচ্চজাতি এবং হরিজনদের একস্থানে বসবাস আবশ্যিক করা যেতে পারে। ভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে চাকুরিতে অগ্রাধিকার বা আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হলে অবশ্য তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জাতি-সংঘাত কমে আসবে। কারণ উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে পরে জাতিভেদের পেছনে যে আর্থিক সংঘাত আছে তার অনেকখানি লাঘব হবে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে আর্থিক কারণই জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার একমাত্র কারণ নয়। কুসংস্কারপ্রসূত অপসংস্কৃতির বেড়া-জালেও আমরা যারা এদেশের প্রতিবাসী, প্রতিবেশী এবং প্রতিভাষী, তারা সবাই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং পরে তাই ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।